বড়গল্প
গিনি রহস্য
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা শেষে এমন একটা বনজঙ্গলে উঠে আসায় আমার আর আহ্লাদের শেষ নেই। সারাদিন বনজঙ্গলে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবার মজাই আলাদা! জঙ্গলে থাকার জন্য একটা টিনের বাছারিঘরও হয়ে গেছে, বাঁশের খুঁটি দিয়ে লম্বা বারান্দা, তালপাতার ছাউনিতে দাদার পড়ার ঘর এবং বারান্দা। সংলগ্ন একটি চালাও রান্নার জন্য হয়ে গেলে মা আমার খুবই প্রসন্ন। দেশ ছেড়ে এসে যা হোক বাবা শেষপর্যন্ত থিতু হতে পেরেছেন। যা বাউণ্ডুলে মানুষ, কখন না আবার পোঁটলাপুঁটলি সম্বল করে সবাইকে নিয়ে রওনা হন!

তবে বাবা যে আর খুঁটি বদল করছেন না, একটা হারিকেন কিনে নিয়ে আসায় তা বোঝা গেল। দু' ক্রোশ দূর থেকে কিছু খাম, পোস্টকার্ড নিয়ে এলে মা আরও আশ্বস্ত। যাক, জায়গাটায় তাঁর মন বসেছে।

একদিন সন্ধ্যায় হারিকেনের আলোয় বাবা বারান্দায়

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

অনাথবন্ধুকে চিঠি লিখতেও বসে গেলেন। আমি, দাদা ঘরের মেঝেতে বসে কুপির আলোয় পড়ছি। বাবা নিবিষ্টমনে কাঠের বাক্সে ভর করে চিঠি লিখছেন। চেঁচিয়ে পড়ছি বলে বাবার মনোযোগে খুবই বিঘ্ন ঘটছে। আমাদের দিক থেকে কোনও ভরসা না পেয়ে মাকে ডেকে বললেন, "দয়াময়ী, তোমার পুত্ররা সামান্য আস্তে পড়লে হয় না ! আমার চিঠির যে পরম্পরা ঠিক থাকছে না। জরুরি চিঠি।"

দাদা গজগজ করছিল। আস্তে পড়লে তার মনে থাকে না। হঠাৎ কী এত জরুরি চিঠি লিখছেন যে, তখন থেকে একটামাত্র হারিকেন দখল করে রেখেছেন ! কুপির আলোয় দাদার পড়তে অসুবিধে হয়, বাবা কিছুতেই বুঝছেন না।

বাবা কিছুক্ষণের জন্য দাদার হারিকেনটা চেয়ে নিয়েছিলেন, চিঠি লেখার পর্ব শেষ হলেই আবার যথাস্থানে হারিকেনটি ফিরিয়ে দেওয়া হবে এই কড়ারে।

চিঠি লেখা কখন শেষ হবে তাও আমরা জানি না। আস্তে আমি পড়তে পারি না, বই বন্ধ করে উঠে পড়লাম। কিন্তু দাদার যে সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, সে ওঠে কী করে ! সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে, হারিকেনটির দখল নিয়ে এবার পিতাপুত্রের কুরুক্ষেত্র শুরু হতে পারে কিংবা রাগে দাদা ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দিতে পারে।

অবশ্য দাদা তার কিছুই করল না। কুপিটা ঠকাস করে বাবার কাঠের বাক্সে রেখে দাদা হারিকেনটি তুলে নিল। তারপর ঘরে ঢুকে ফের পড়তে বসে গেল। পড়ার সঙ্গেই একবার বলল, "কাল আবার চিঠির বাকিটা লিখবেন।" হারিকেনটি আসার পর থেকেই দখল নিয়ে পিতাপুত্রের লড়ালড়ি চলছে, আজ মনে হল বেশ চরম আকার নেবে। দাদার এটা ঘোরতর অন্যায়, বাবার মুখ না দেখলে বোঝা যেত না। দাদাকে তিরস্কারও করা যায় না। জননী তা হলে রেগে যাবেন।

বাবা বাধ্য হয়ে কাতর গলায় বললেন, "দেখলে দয়াময়ী, তোমার পুত্রের কাণ্ডখানা। কুপিটা রেখে হারিকেন নিয়ে গেল ! কুপির আলোতে চিঠি লেখা যায় ! আমার কাজ কাজ না ? পড়াশোনা করে তোমার পুত্রটি ভেবেছে লাট হবে ! দু'দণ্ড সবুর সয় না !"

দাদা ওদিক থেকে জবাব না দিয়ে পারেনি, "আজ কি শেষ করতে পারবেন চিঠিটা ! কত কিছুর খবর দিতে হবে। যেটুকু লিখেছেন তাই পড়ে দ্যাখেন, কী-কী বাদ গেল। গুছিয়ে লিখতে হবে না ? শেষে বলবেন, পুত্রদের তাড়নায় কত বড় একটা খবর দেওয়া গেল না অনাথবন্ধুকে।"

বাবা গুম মেরে গেলেন। মাকে সালিসি মেনেও লাভ হল না। বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নেই রান্নাঘর থেকে ! ছ্যাঁক- ছোঁক শব্দ কানে আসছে। দাদা পড়ায় ব্যস্ত। আকবর, দ্য গ্রেট এম্পারার—ভারী-ভারী ইংরেজি শব্দ দাদার পাঠ্য বইয়ে আছে। এতে যে বাড়িঘরের মর্যাদা বাড়ে, বাবা কিছুতেই বোঝেন না। দাদার সামনে পরীক্ষা, তাকেও দোষ দেওয়া যায় না। অনাথবন্ধুর চিঠিটি বাবার কবে শেষ হবে, তাও ঠিক বলা যায় না।

"ওরে, তোর বাবার কি খবর লেখা শেষ হল। কখন থেকে খেতে ডাকছি কোনও সাড়া নেই !" দাদা হারিকেন তুলে নিয়ে গিয়ে ভালই করেছে। কারণ, বাবার চিঠি লেখা শেষ হতে কত রাত হয়ে যেত, কিংবা তাঁর দীর্ঘ চিঠি, দীর্ঘ খুব যে নয় তাও বুঝি, একটি বাক্য শেষ করে পরের বাক্যটি ধরতে তাঁর অনেক সময় লেগে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে সংসারে একটিমাত্র হারিকেন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলতেই পারে।

যাই হোক, সপ্তাহখানেক ধরে হারিকেন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়ার পর বাবার চিঠি লেখা শেষ। এই সপ্তাহখানেক রাত হলেই পিতাপুত্রের যুদ্ধে আমি ভারী মজা পেতাম। বাবার আদ্যাশক্তি অর্থাৎ আমার জননী মাঝে-মাঝে বাবার ওপর খুবই কুপিত হতেন।

"তুমি কী ! অনাথবন্ধু শেষে তোমাকে উদ্ধার করবে ! তার খেয়েদেয়ে কাজ নেই, চিঠি পেয়ে সে এমন একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় চলে আসবে ভাবছ ! সে বিষয়ী মানুষ, সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলে এমন একটা জঙ্গলে কেউ বাড়িঘর বানায় !"

"এটাই তোমার বিশেষ দোষ মহামায়া। কিছুতেই তুষ্ট নও। এ-দেশে এসে কম ঘুরেছি ! কত আঘাটায় নৌকো ভেড়াতে হয়েছে। একটুখানি বাসা মানুষের কত দরকার বোঝো না ! দেশে আর কেউ থাকতে পারবে ভাবছ !"

মাকে কখনও বাবা একনামে ডাকেন না। কখনও বলবেন, "তোমাদের জননীর কী ইচ্ছে।" কখনও বলবেন, "তোমাদের দেবী জগজ্জননী কি আমার উপর রুষ্ট হয়েছেন।" অথবা বলবেন, "তোমাদের করুণাময়ী মাকে খবর দাও, দু'জন অতিথি দুপুরে এই গৃহে সেবা করবেন।"

বাবার কাছে মা আমার কখনও ইচ্ছাময়ী, কখনও দয়াময়ী। আবার কখনও চামুণ্ডা, ধুমাবতী, মা'র এই রূপবর্ণনা কতটা সঠিক, বাবার আচরণে আমরা তা টের পেতাম।

যাই হোক, চিঠি শেষ করে একদিন সকালে বাবা নোটিশ জারি করে দিলেন— "অনাথকে কী লিখলাম তোমাদের সবার শোনা দরকার।"

অবশ্য দাদা বাবার কথায় আদৌ গুরুত্ব দেয় না, তবু বাবা যখন ডেকেছেন, তখন শোনাই যাক, তাঁর কী বক্তব্য।

আমি বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দাদা ঘরের ভেতর মাচানে বসে একটা ছেঁড়া বই আঠা দিয়ে তাপ্পি মারছিল, দেশ থেকে আসার সময় দাদার পাঠ্য বই বিশেষ আনা যায়নি, দু'-আড়াই ক্রোশ দূরের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বদান্যতায় কিছু টুটাফাটা পুস্তক বাবাই সংগ্রহ করে এনেছিলেন— কারণ বাবার বিশ্বাস, যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুই আগে শেষ করা দরকার, পরে খুঁজে- পেতে পেলে দেখা যাবে। সুতরাং এহেন আমাদের পিতৃদেবের কী ইচ্ছে হয়েছে সহসা, জানার কৌতূহল থাকতেই পারে।

বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে আমি, ঘরের ভেতরে মাচানে বসে দাদা, বাবা বারান্দায় জলচৌকিতে, তিনজনই আপাতত মুখোমুখি। তবু তিনি উশখুশ করছিলেন, কিছুটা নীরব, কিছুটা প্রত্যাশাও আছে, আর একজন যে নেই আমরাও বুঝতে পারি। একজন বললে ঠিক হবে না, বোনকে ধরলে দু'জন। তারা এলে ভাল হয়, তবে তাদের পাত্তা নেই, ঠিক পাত্তা নেই বলাও যায় না, ওদিকের তালপাতার ছাউনিতে দু'জনের কথাবার্তা আমাদের কানে আসছে।

বাবা শেষে কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "দয়াময়ী কি খুব ব্যস্ত ?"

আমি না ডেকে পারলাম না, "মা, বাবা দয়াময়ীকে খুঁজছেন। তুমি এসো। বাবা কখন থেকে বসে আছেন, তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন বলে। তুমি না থাকলে হয় !"

"তোমার বাবাকে বলো এখন আমার হাত জোড়া। যেতে পারছি না। ওখান থেকে পড়লেই শুনতে পাব। কান আমার খাটো যে নয়, বাবা তোমার ভালই জানেন।"

"আপনি বক্তব্য পেশ করতে পারেন বাবা। মা আসতে পারছেন না। এখান থেকে বললেই যথেষ্ট। কানে খাটো নন মা।"

বাবার খুবই স্তিমিত গলা। "সব আমিও শুনলাম। তোমার মা কখন যে বরদা দুর্গা, আর কখন যে ভয়ঙ্করী কালী সেই বুঝতেই শেষবেলা হয়ে গেল। তিনি কাছে না থাকলে যে হয় না ! জরুরি চিঠিটি পাঠাব অনাথবন্ধুকে, তাঁকে না শোনালে চলবে

কেন !"

তারপর কিছুটা বিরক্ত হয়েই যেন বলা, "তিনি করছেনটা কী ? পিলু, এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে একবার দেখে এলে ভাল হত না !"

রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। মাকে বললাম, "তুমি না গেলে বাবা চিঠি পড়া শুরু করতে পারছেন না।"

চিঠিটা লিখলেন, কী লিখলেন দয়াময়ীর শোনা দরকার।

চিঠিতে অনাথবন্ধুকে এতসব সুখবর দিলেন, দয়াময়ী শুনে বুঝুক, দেশ ছেড়ে না গেলে অনাথবন্ধুকে এতসব সুখবর দেওয়ার সুযোগই পাওয়া যেত না।

অগত্যা দয়াময়ী চৌকাঠের পাশে এসে দাঁড়ালে বাবা একবার ইচ্ছাময়ীর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক মা-তারা।"

বাবার এই ভূমিকা দাদা একদম সহ্য করতে পারে না। দাদা বলল, "আমি উঠি।"

"তুমি উঠবে মানে !"

"আমার পড়া আছে।"

"আমরা আর পড়াশোনা করিনি ! গুরুজনের কথা তোমরা আজকাল দেখছি বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করতে চাও না।"

মা-ও বিরক্ত। "তুমি কী শোনাবে ?"

"চিঠি। অনাথবন্ধুকে চিঠি।"

"সে তো সাতদিন ধরে লিখেই যাচ্ছ। শেষ হয়েছে ?"

"হয়েছে।"

"ঠিক আছে, পড়ো।"

বাবা খুব প্রীত হলেন। সবাই তাঁর চারপাশে বসে, না হয় দাঁড়িয়ে।

বাবা একবার আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, "তুমি বোসো। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ?"

তারপর বাবা রুলটানা ফুলস্কেপ পাতাটি মেলে ধরেছিলেন। আমরা শুনছি।

"শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়। তাং ১৩ শ্রাবণ পূর্ণিমা, ১৩৫৮, ভূতির জঙ্গল, নিমতা।

"সুজন সুহৃদ্‌বরেষু, প্রিয় অনাথ, আমরা বর্তমানে একটি জঙ্গলে আশ্রয় পাইয়াছি। জলের দরে আট-দশ বিঘার মতো জমি ক্রয়ও করা গেছে। জায়গাটা খুবই উর্বর। তবে গাছপালা এবং ঘন বনজঙ্গলে দেড়-দু'ক্রোশ পথ অগম্য। লোকালয় কাছাকাছি বলতে, সড়কের ওপারে বাগদি পাড়া। অদূরে একটি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার আছে। আমার দুর্জয় সাহসে তাদের কিঞ্চিৎ মতিভ্রম হয়েছে। এদিকটায় তারা আগে কাঠকুটো সংগ্রহ করতে বনজঙ্গলে ঢুকে যেত, আমার বাড়িঘর হয়ে যাওয়ায় তারা জঙ্গলে ঢুকতে কুণ্ঠাবোধ করছে। আমরা মানুষ না অপদেবতা এই সংশয় তাদের মধ্যে মনে হয় এখনও সেভাবে নির্মূল হয়নি। তবে হয়ে যাবে। পিলু এবং আমি উভয়ে প্রাণপাত করে তাদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টায় আছি।"

এর পর বাবা মাকে বললেন, "জল দাও।"

বোধ হয় বাবার গলা শুকিয়ে গেছে। মায়া ছুটে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে রাখলে তা তিনি খেলেন।

মা রেগে গিয়ে বললেন, "খালি পেটে জল খেলে ! এখনও মুখে কিছু দাওনি। বাকিটা বিকেলে শুনব।"

"আরে, না, না, হয়ে যাবে। শোনো।"

"আমাদের এই জঙ্গলটি ভারী সুন্দর অনাথ। এখানটায় একসময় রাজরাজড়ার দেশ ছিল। নীলকুঠির সাহেবরাও এই জঙ্গলে বসবাস করে গেছে। মাইলখানেক দূরে যে সড়কটি আছে, তারও ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। বাংলার শেষ স্বাধীন

নবাব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজয়ের পর এই সড়ক ধরেই পালিয়েছিলেন। ক্রোশখানেক দূরে একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদ আছে। ঠিক পরিত্যক্ত বলা যায় না, তিনজন পেয়াদা, দু'জন আমিন, একজন রাজকর্মচারী একটি কুঠিতে বসবাস করে। ওই এলাকায় কিছু পাকাবাড়ি আছে। একসময় রাজার পিলখানায় একটি হাতিও ছিল। সে যাই হোক, তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, জগদ্বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী জগৎ শেঠের বাড়ি এই জঙ্গল থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে, পিলু এবং আমি সেখানে একবার যাব মনস্থ করেছি। বাড়িটির ধ্বংসাবশেষ দেখলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। সবচেয়ে বড় কথা, এই জঙ্গলেই পুরাকালে রেশমের রমরমা ছিল। রাজপ্রাসাদের অদূরে নদী, যদিও নদী এখন হেজেমজে গেছে, বিদেশি পণ্যসম্ভারে ভরতি বড়-বড় জাহাজ এই বন্দরে ভিড়ত। রেশম বোঝাই হয়ে বিদেশে পাড়ি দিত। ভাবলে আমার দারুণ অনুভূতি হয়।"

মা বললেন, "হয়েছে ?"

"না, না। বাকিটুকু শোনো।"

বাবা পাতাটি উল্টে নিলেন। দুর্মূল্যের বাজার, কাগজের অপচয় যাতে না হয়, এ-পিঠ ও-পিঠ দু'-পিঠেই বাবার হিজিবিজি হস্তাক্ষরে ভরে আছে।

মা নিরুপায় হয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দাদা আর কাছে নেই। বাবা চিঠির বয়ান নিয়ে খুবই মশগুল। মা চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এতেই বাবা খুশি।

"অনাথ, তোমার জেনে রাখা ভাল, জঙ্গলের শেষ দিকটায় একটা বড় মাঠ আছে, মাঠ-শেষে রেললাইন, ছোট্ট একটি স্টেশনও আছে। ওই স্টেশনে নেমে তুমি ভূতির জঙ্গল বললেই জায়গাটা খুঁজে পাবে।"

মা না বলে পারলেন না, "স্টেশনের নাম লিখতে হবে না ?"

"সবুর করো। এত তাড়া কিসের। আমাকে এতটা অবোধ কেন ভাবো বলো তো। এই যে আশ্রয়টুকু পেয়েছ তার কথা ভাববে না ! কে করল !"

তারপর বাবা আবার পড়লেন।

"জায়গাটা এখন অনাবাদী। কিন্তু বিশেষ উর্বর। কিছু পেঁপেগাছ, কলাগাছ লাগিয়েছি। ফলন অতি উত্তম। দেশের গাছপালার বীজও রোপণ করেছি। গাছ বড় হয়ে উঠছে। জঙ্গল সাফ করছি পিতাপুত্রে। বিঘেখানেক জমি সাফ করা গেছে। তবে সাপের উপদ্রব আছে। বিচিত্র বর্ণের সব কালনাগিনী জঙ্গলের শোভা বর্ধন করছে। চিতি, শঙ্খচূড়, ডাঁড়াশ, শ্বেত গোখরোই বেশি। ঘরে এখন গোরুর দুধ হয়— তোমার বউদি দেশের পালাপার্বণ একটাও বাদ দিচ্ছেন না। গৃহদেবতার ঘরটিও হয়ে গেছে। একটা ভাঙা সাইকেল ঠাকুরের কৃপায় জোগাড় হয়ে গেছে। পিলু কী করে যে জোগাড় করল সে-ই জানে ! দু-চার ক্রোশের দূরত্ব এখন আমাদের কোনও সমস্যা নয়। সে তার দাদাকে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছে।"

মায়া মুখ বাড়িয়ে বলল, "আমিও শিখছি বাবা।"

"ভাল করছ। তবে মেয়েদের এটি অনুচিত কাজ। তোমার শেখার মধ্যে কোনও বাহবা থাকে না।"

"সর্বশেষে জানাই অনাথ, পানীয় জলের সঙ্কটও নেই। বাগদিপাড়ার কাছে একটি সরকারি টিউকল আছে। জল খুবই মিষ্টি। আর অত্যন্ত শীতল। গ্রীষ্মের দুপুরে তৃষ্ণার্ত হলে এই জলপানে পরমায়ু বাড়ে। পিলুই ঘড়া করে দু'বেলা দু'ঘড়া জল নিয়ে আসে। নিত্য ব্যবহারের জলেরও অভাব নেই। জঙ্গলের মধ্যে একটি পুষ্করিণী আবিষ্কার করা গেছে। সেটির সংস্কার করেছি। অবাক, এই ঘোর জঙ্গলে এমন স্বচ্ছজলের বন্দোবস্ত কার দয়ায় ! আসলে ঠাকুরেরই অশেষ কৃপা। না হলে জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে—"

বাবা চুপ করে আছেন।

"জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে কী ?" মা অত্যন্ত অধীর গলায় প্রশ্ন না করে পারলেন না।

"না, মানে..."

মা আরও অধীর।

বাবা বললেন, "তোমাদের কি মনঃপূত হবে কথাটা !"

"কেন হবে না !"

"জঙ্গলটি সাফ করতে গিয়ে যদি একটি গিনি পাই, কেমন হয় !"

"বাবা, গিনি কী ?" আমি না বলে পারলাম না।

"গিনি বোঝো না ! এত বড় হলে কেন ! তোমার জননী জানেন। তিনটি গিনি দিয়ে তাঁর গলার বিছেহারটি তৈরি করা হয়েছিল। কী, ঠিক কি না ?"

মা অত্যন্ত কুপিত। অনাবশ্যক কথা সব। যদিও আমরা জানি, বাবা এই সম্পত্তি ক্রয় করেছেন মায়ের শেষ সম্বল গলার বিছেহারটি বিক্রি করে। কিছুদিন স্টেশনে, কিছুদিন পোড়োবাড়িতে, শেষে এক আত্মীয়ের বাড়ি। কোথাও তিষ্টোতে পারিনি। দেশ ছেড়ে এসে বাবা যে বড়ই বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন, হাড়ে-হাড়ে এটা আমরা যথেষ্ট টের পেয়েছি। মানুষের ঘরবাড়ির বড় দরকার।

সহসা মা কেঁদে ফেললেন। রেগে গেলে আমার জননীর এটা হয়। তিনি নিরুপায় রমণীর মতো চোখের জল মুছতে থাকলেন।

"আমাদের কী হবে ?"

দাদা আর বসে থাকল না। তার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, সকালবেলায় বাবার বকবকানি শুনলে তার পেট ভরবে না। সে তার পাঠ্যপুস্তক এবং একটি বস্তা নিয়ে ফের তালপাতার ছাউনিতে ঢুকে গেল। আমার জননীর যে কী হয় !

বললাম, "কী হল ?"

"তোমার বাবাকে বলো, সকালবেলায় আবোল-তাবোল বকলে আমার বুক ধড়ফড় করে।"

আমি না বলে পারলাম না, "আচ্ছা বাবা, সকালে উঠে আপনি তো ঠাকুরের নাম করেন ! আজ কী হল আপনার ?"

বাবা হঠাৎ ধমকে উঠলেন, "চোপ, সব্বাই মাতব্বর। আমি কি মানুষ না ! নিজের মনোবাঞ্ছার কথা জানালে, আবোল-তাবোল বকা হয়। তবে সবটা শোনো দয়াময়ী—আপনার সুখের জন্য সব করছি। কথায়-কথায় আর আমাদের চোখের জল ফেলার সময় নেই। এত বড় জঙ্গলটা আমার সাধ্য নেই ক্রয় করার। তাই অনাথবন্ধুকে চিঠি দিচ্ছি। সে যদি আসে ! গাঁয়ের সবাই যদি আসে, লোভে পড়ে চলে আসতেই পারে। জলের দরে জমি। সে-দেশে কেউ আর থাকতে পারবে ! নতুন করে আমাদের গ্রামটার এখানে পত্তন হলে কার কী ক্ষতি ! খারাপ কী লিখেছি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"গিনির কথা লিখতে গেলে কেন তুমি ?"

"পাওয়া গেছে তো লিখিনি, 'যদি পাই' লিখেছি। গোপন ধনসম্পদ মাটির গর্ভে যে নেই, কে বলবে ! জঙ্গলটার নীচে একদা একটি পরিত্যক্ত বন্দরনগরী ছিল, জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে কারও কপালে জুটে যেতেই পারে। গুপ্তধনের লোভে ঝেঁটিয়ে চলে এলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাই লিখেছি, গিনি যদি একটা পাই...। আসলে সঙ্কেত রেখে দিয়েছি। সঙ্কেত বোঝো ?"

মায়ের তখন এক কথা, "না, তুমি ও-লাইনটা কেটে দাও। পেলে আমরাই পাব। দশকান করে সব যজিয়ে দিতে হবে না।"

আমি একবার মায়ের দিকে তাকাচ্ছি, একবার বাবার মুখের দিকে। যেন গিনি পাওয়া যাবেই। আবার কেন যে মনে হয় বাবা হয়তো কিছু পেয়েছেন। মায়ের এই সতর্কতা, এসব বিষয়ে

দশকান করা ঠিক হবে না, তা ছাড়া বাবা চিঠি কীভাবে শেষ করলেন, তাও শোনা হয়নি। বাবা দেশ ছেড়ে এসে ভাল নেই। সহায়সম্বলহীন মানুষ। উপার্জন নেই। চার-পাঁচটি পেটের অন্ন সংস্থান সোজা কথা না। তবে বাবা যখন আছেন আমাদের ঘাবড়াবারও কিছু নেই। ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বাবা হয়তো চিঠি লিখেছেন অনাথকাকাকে। সবাই এসে এখানে ঘরবাড়ি তৈরি করলে বাবার যজন-যাজনের সুরাহা হবে। একঘর ব্রাহ্মণের বেশি কিছু দরকারও হয় না।

ওফ, কী যে মজা হবে না! গাঁয়ের সব মানুষ এসে গেলে, ঘরবাড়ি তৈরি করলে, জমিজমা চাষ করলে, পূজাপার্বণ লেগেই থাকবে। শনিপূজা, ক্ষেত্রপালের পূজা, বাস্তুপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা—বাবাই আমার তখন একমাত্র ঠাকুরকর্তা। বাড়িটার কত ইজ্জত বেড়ে যাবে। গৃহদেবতার জন্য রোজ সিধা আসবে। শনি-মঙ্গলবারে ঠাকুরের ভোগ হবে। খিচুড়ি, পায়েস, লাবড়া, গোবিন্দভোগ চালের ভাত, পঞ্চব্যঞ্জন—বাবা সকালে উঠে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশনের জায় ধরে দেবেন, সেইমতো কাজ হবে। বারান্দায় সকাল থেকেই ভিড় হবে যজমানদের। দিনক্ষণ, তিথি-নক্ষত্রের সব খবর বাবা না দিলে তারা সব জলে পড়ে যাবে।

তার সঙ্গে একটা যদি গিনি পাওয়া যায়, মন্দ কী! "যদি একটা গিনি পাই কেমন হয়"—বাবার এই আশা-কুহকিনীর নিশ্চয় কোনও হেতু আছে। আপাতত বাবা চিঠিতে অনাথকাকাকে আর কী-কী খবর দিলেন এই গভীর অরণ্যটি সম্পর্কে, আমার তাই জানার বিশেষ কৌতূহল।

বাবার ইচ্ছাময়ী চৌকাঠে এতক্ষণ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পাত্র নন। নিশ্চয়ই বাবা আরও কিছু বেফাঁস খবর দিয়ে বসে আছেন। চিঠি পড়া শেষ না হলে তিনি যে চৌকাঠ থেকে নড়বেন না, তাঁর হাবেভাবেই তা বোঝা যায়।

বাবা হয়তো ভাবছিলেন, লাইনটি কেটে দেওয়া সঠিক কাজ হবে কি না। কারণ অনেক ভেবেচিন্তে সাতদিনের মাথায় চিঠি লেখা সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর পক্ষে ইচ্ছাময়ীর এককথায় লাইনটি উড়িয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। শেষে কী ভেবে বললেন, "দেখি একটা কলম।"

আমি দৌড়ে গিয়ে দাদার কলমটি তুলে আনলে, লেগে গেল ধুন্দুমার কাণ্ড। তার কলমের বারোটা বাজুক, সে চায় না। সে ছুটে এসে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে চাইলে জোরাজুরি শুরু হয়ে গেল। বাবা বললেন, "আরম্ভ হয়ে গেল কুরুক্ষেত্র।"

আমিও ছাড়ব না। দাদাও কিছুতেই দেবে না। বাবা নাকি কয়েকবারই তার কলমের দফারফা করে ছেড়েছেন।

বাবা মায়াকে বললেন, "আরে, আমার কী নেই, তোদের কলমের প্রত্যাশা আমি করি! দোয়াত-কলম আমারও আছে।"

আমিও জানি, বাবা তাঁর কলমেই লিখতে পছন্দ করেন, কিন্তু দাদা তার কলমটিতে কাউকেই হাত দিতে দেবে না। বাবার এমন জরুরি কাজেও কলমটি যে দাদার কত মহার্ঘ্য বুঝুন বাবা। এই হল গে বাবার বড় পুত্র।

মা বললেন, "কী আরম্ভ করলি তোরা! কলম লাগবে না। তোদের বাবা কি ভিখারি, তার কি কিছু কমতি আছে!"

মায়ের এমন কথায় বাবা হৃষ্টচিত্তে লাইনটা কেটে দিয়ে ফের পড়তে শুরু করলেন।

"এই জনহীন অরণ্যভূমিতে মাঝে-মাঝে দেবী আবির্ভূতা হন। জ্যোৎস্নারাতে মনসাতলা থেকে ফেরার সময় তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। বনদেবীকে বলেছি, আপনার অভয়ারণ্যে এসে উঠেছি। পুত্রকন্যা নিয়ে আছি। আপনার সদাশয় বরাভয় আমাদের রক্ষা করুক।"

দাদা ওদিক থেকে ফোড়ন কাটল, "যত্ত সব বিগ-বিগ টক। যত্ত সব আজগুবি কথা। তুমি কি থামবে বাবা! আমাকে পড়তে দেবে না!"

মা বললেন, "দেবী! কী লিখেছ যা-তা। এখানে দেবীরা মরতে আসবে কোত্থেকে! তোমার মতো বাউণ্ডুলে মানুষের পক্ষে সবই দেখা সম্ভব।"

বাউণ্ডুলে বলায় বাবা ক্ষুব্ধ হতেই পারেন। দেশের কে কোথায় এসে উঠেছে, আত্মীয়স্বজন তো আমাদের মেলা, একবার তাদের খোঁজে বের হলে বাড়ি ফেরার নাম করেন না বাবা। আমাদের জঙ্গলে ফেলে রেখে হৃষ্টচিত্তেই তিনি ঘুরে বেড়াতে পারেন। আমরা কী খাই, কীভাবে বাঁচি, বাবার যেন দেখার কথা নয়। তিনি কে, তিনি নিমিত্ত মাত্র। যিনি দেখার তিনি তো বাড়িতেই অধিষ্ঠান করছেন। তাঁকে ঠিকমতো ফুলজল দিলেই হল। আর পিলু তো আছে।

আমার ওপর বাবার এত ভরসা! নিত্যপূজাপদ্ধতি এজন্য বাবা শিখিয়ে দিয়েছেন। দেশে থাকতেই উপনয়ন হয়ে যাওয়ায়, তিনবেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজাপাঠ সব আমার জানা। সুতরাং ঠাকুর-দেবতার দায়ও অনায়াসে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বাবার দেশান্তরী হতে বাধত না। যেতেন একদিনের বলে, ফিরতেন সপ্তাহ পার করে। যখন ফিরতেন মাথায় একটা বড় পোঁটলা, তাতে পূজাপাঠের চাল, ডাল, শাড়ি, কোরা কাপড়—কার আদ্যশ্রাদ্ধ সেরে ফিরেছেন। ভালমন্দ খাওয়ার লোভেও মাঝে-মাঝে বাড়ি থেকে যে বের হয়ে যেতেন বাবার ইচ্ছাময়ী ঠিক টের পেতেন। কাজেই মা বাবাকে বাউণ্ডুলে স্বভাবের বললেও দোষ দেওয়া যায় না।

বাবা গুম মেরে আছেন। পুত্রকন্যার সামনে তাঁর এই হেনস্থা! তিনি বাউণ্ডুলে! এত কষ্টে ঘরবাড়ি করার এই পরিণাম! নিরাশ্রয় মানুষ নন তিনি। তাঁকে খাটো করলে তিনি ক্ষিপ্ত হতেই পারেন।

আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল।

"আচ্ছা মা, তুমি কী! বাবাকে বাউণ্ডুলে বলতে তোমার মুখে আটকাল না। বাবা না থাকলে আমাদের ঘরবাড়ি হত!"

বাবা যেন সাহস পেয়ে গেলেন।

উঠোনটি পার হয়ে পেঁপেগাছ, কলাগাছ—আম- কাঁঠালের কলম এবং বিঘেখানেক জমি সাফ করা গেছে বলে বাইরের রাস্তা থেকে জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটাকে বাড়ি বলেই মনে হয়, এমন সহজ সত্যকে অস্বীকার করা ইচ্ছাময়ীর খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে।

মাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন।

"তোমার বাবা সক্কালবেলায় কী শুরু করল! তিনি এখন দেবী দেখে বেড়াচ্ছেন। শেষে আরও যে কী দেখবেন এবারে দ্যাখো।"

মায়ের পক্ষ না নিলে চলে না।

"আচ্ছা বাবা, আপনার দেবী-সাক্ষাতের কথা না বললে হত না! দেখছেন মা রাগ করছেন।"

"তোমার মা কবে তুষ্ট ছিল আমার ওপর? আমি দেবী দেখলে অপরাধ। তোমার মাকে গিনি কে দিল। তিনি কি জানেন না দেবীর কৃপা না হলে এসব হয় না! তোমার মা দশ কান না হয়, গোপন রাখতে বলেছে।"

আমার চোখ বিস্ফারিত। দাদাও ছুটে এসেছে। দাদার চোখ কপালে উঠে গেছে।

বাবা খুবই আহ্লাদিত, খবরটি ফাঁস করে দিয়ে। তিনি বললেন, "বোঝো এবার! ঠাকুরের সিংহাসনের তলায় আস্ত একটা গিনি। প্রায় একটি স্বর্ণমুদ্রায় শামিল। কী পুলক তোমার জননীর! গরিব বামুন, ভগবানের বিবেক আছে। তাঁরই কৃপা। আর দেবী দেখলে অপরাধ!"

আমি মায়ের দিকে তাকিয়ে আছি।

"কবে পেলে মা!"

"কী জানি, তোমার বাবা জানে !"

দাদাও এবারে সংসারী হয়ে উঠেছে। বলল, "সত্যি মা, ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে, কই দেখি মা।"

মায়াও বলল, "দেখাও মা।"

আমি জানি, বাবা আমার মিছে কথা বলেন না। এ-দেশে এসে আমার বাবা বড়ই বিপাকে পড়ে গেছেন। ঠাকুর-দেবতা আর এই অরণ্যভূমি ছাড়া আমাদের আর কোনও সম্বলও নেই। দাদার বই কেনারও সামর্থ্য নেই বাবার। বনদেবীর কৃপা না থাকলে একটা আস্ত গিনি পাওয়া গরিব বামুনের পক্ষে সম্ভব নয়। এত বড় খবরটা বাবা ফাঁস না করে দিলে আমরা জানতেও পারতাম না।

আমাদের বাড়ির উত্তরে, পুবে, পশ্চিমে অরণ্যভূমি। শাল, সেগুন, পলাশ, শিমুল, পিপুল, হরীতকী গাছের ছড়াছড়ি। খুবই দুর্গম অঞ্চল, তবে আমি এই গভীর জঙ্গলে একটি রাস্তা আবিষ্কার করেছি। সকালে বের হয়ে এই পথটি কোথায় গেছে তা দেখার কৌতূহল আছে। যদি বাবার মতো সত্যি কোনও সকালে অথবা জ্যোৎস্নায় বনদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় ! তিনিও যদি দয়া করে আমাকে একটা গিনি দেন !

॥ ২ ॥

গোরুটা মাঠে দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছি। বাবার মেলা কাজ। গোরুর পরিচর্যার ভার আমার ওপর। সকালেই বের হয়ে পড়েছি গোরু নিয়ে। সামনে যতদূর চোখ যায় উরাট জমি। গোরুটাকে জায়গামতো ছেড়ে দেওয়া। সারাদিন নিজের মরজিমতো ঘাস খেয়ে নিজেই সাঁঝ লাগলে ঘরমুখো হবে।

অবশ্য আগে গোরুটা নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি কোথাও ঘাস খাওয়াতাম। একবার লোভে পড়ে ঘাসের খোঁজে ল্যাংরি বিবির হাতা পার হয়ে হেতমপুরের মাঠে গিয়ে খুবই বিপাকে পড়ে যাই। গোরুটা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসার সময় দেখি জঙ্গলটা ঠিকই আছে। তবে আমাদের বাড়িটা নেই। দূর থেকে বিশাল সব বৃক্ষ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছিল না। হঠাৎ কেন যে মনে হয়েছিল, জঙ্গলের ভেতর আমরা সত্যি বাড়ি করেছি তো ! কোথায় গেল বাড়িটা !

বড় সড়কে উঠে এসেও বাড়িটা কোনদিকে বুঝতে পারছিলাম না। এত বড় জঙ্গলে আমাদের বাড়িটা কোথায় যে হারিয়ে গেল ! সামনে মাঠ, শনের জঙ্গল, তার ভেতর দিয়ে ছুটছি, কোথায় বাড়ি ! এক বিশাল বাঁশের জঙ্গলে ঢুকে যেতেই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলেছিলাম। বাড়িটা শেষপর্যন্ত ভুতির জঙ্গল বুঝি গিলে খেয়েছে।

এই নির্জন পৃথিবীতে কাউকে বললে বিশ্বাসই করবে না, ভুতির জঙ্গলে কেউ বাড়িঘর তৈরি করে থাকতে পারে। বাগদিপাড়াটা কোনদিকে, তাও বুঝতে পারছিলাম না। সড়কে দুটো-একটা গোরুর গাড়ি ছাড়া কিছু চোখেও পড়ছে না। দু-একজন সাইকেল-আরোহী আমাকে রাস্তায় দেখেই জোরে পালাচ্ছে।

বুকের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি ছোটাছুটি করছিলাম। আমাদের বাড়ির সামনে বড় একটা শিশুগাছ, রাস্তা থেকেও দেখা যায়। দূর থেকে গাছটাকে খুঁজছি। গাছটা খুঁজে পেলেই সোজা ছুটে যাব। গাছটা দেখলামও। শনের জঙ্গলে ঢুকতেই গাছটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সারাদিন ঘোরাঘুরি সার। মাঝে-মাঝে কাতর গলায় চিৎকার করছি, "দাদা রে, তোরা কোথায় !" না, কারও সাড়া নেই।

জঙ্গলে কিংবা মাঠেই হয়তো ঘুরে বেড়াতাম। শুভদা দেখছি আসছে। শুভদাকে যে মাঠে ছেড়ে দিয়ে এসেছি তাও ভুলে গেছি। শুভদাকে দেখে মনে বল এসেছিল। সাঁঝ লেগে গেছে। বিশাল সব বৃক্ষের মাথায় দুটো-একটা নক্ষত্র ফুটে উঠেছে। আর তখনই মনে হল, জঙ্গলের একদিকটায় লম্ফের আলো। পড়িমরি করে গোরুটাকে নিয়ে উঠে আসার সময় শুনতে পেলাম, দাদা, বাবা, মা সবাই জঙ্গলের বাইরে এসে আমায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে।

সেই থেকে গোরুটাকে নিয়ে সড়ক পার হয়ে বেশিদূর যেতাম না। যদি সত্যি কখনও বাড়িটা আমাদের নিখোঁজ হয়ে যায়, সেজন্য জঙ্গলের কাছাকাছি মাঠে গোরুটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতাম। আজকাল অবশ্য সব আমার চেনা হয়ে গেছে। কেবল জঙ্গলের ভেতরের রহস্যটা জানা নেই। দুর্গম বলে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতেও ভয় করে। ঢুকে গেলেই কেমন গা ছমছম করে। কিন্তু বাবার বনদেবীর রহস্যটা যে কী, বুঝতে পারছি না। তারপর ঠাকুরঘরে যে একটি গিনি পাওয়া গেছে ! কে রেখে গেল ! কে দিল ! কে এত সদাশয় যে, গরিব বামুনের অন্নকষ্ট দূর করতে চুপিচুপি এমন একটা কাজ করে পালিয়েছে।

ইতিমধ্যেই মা বাবাকে একটি ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছেন। সেই মতো কাঁসার থালা-বাসন, দুটো শীতলপাটি, একটি পেতলের কলসি, গৃহদেবতার জন্য তামার কোষাকুশি, পেতলের ডেগ—ভোগের জন্য বড় জামবাটি সবকিছুই আনা হয়েছে। শনির কোপে শ্রীবৎস রাজা হয়ে আছেন আমার পিতৃদেব। যদি বারের পুজো দিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ! তবে বাবা দিনক্ষণের অপেক্ষায় আছেন। বারের পুজো শুরু করার কথাও হয়ে আছে।

আর একটি মনোবাঞ্ছা ইদানীং পিতৃদেব মনে-মনে পোষণ করে আছেন। সামনের কাঠাখানেক জমিতে পালংশাক লাগাবেন। জমি সাফ না করলে হয় না। বাঁশের গুঁড়িগুলি কোদাল, খোন্তা, শাবল না হলে ওপড়ানো মুশকিল। বাড়িতে কোদাল এবং দা আছে। শাবল, খোন্তাও গিনিটির দৌলতে বোধ হয় কেনা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। আজ বাবার দুই পুত্র এবং তাঁর নিজের একত্রে বাঁশের গুঁড়ি ওপড়ানোর কথা আছে।

এসব কাজে আমার উৎসাহ খুব। শুধু পড়তে বললেই মাথা গরম হয়ে যায়। অবশ্য বাবা কখনও জোরজার করেন না পড়া নিয়ে। মা পড়া নিয়ে ঝামেলা পাকালে বাবার হিতোপদেশ— "দয়াময়ী, আগে থিতু হয়ে আমাদের বসতে দিন।" গুরুত্বপূর্ণ কথায় মাকে বাবার আপনি-আজ্ঞে করার স্বভাব। "সারাজীবনই পড়ে আছে। সুযোগ-সুবিধেমতো পড়তে বসলেই হবে। ইস্কুলে ভর্তি করি, দু-তিন ক্রোশের মধ্যে স্কুলই বা কোথায় ! একটা সাইকেল হয়ে গেছে, সবই হবে। বড়টা প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়ার তোড়জোড় করছে, ভাল, দ্বিজপদকে বলেছি যদি অঙ্ক, জ্যামিতির পুস্তক সংগ্রহ করে দিতে পারে।"

দু'ক্রোশ দূরে মনসাতলায় দ্বিজপদর দোকান। কিছুটা গঞ্জের মতো জায়গা। মনিহারি, মুদিখানার সওদা বাবা দ্বিজপদর দোকান থেকেই সারেন। আদর্শলিপি, বর্ণপরিচয়, হজমির ওষুধ, কুইনিন, সবই পাওয়া যায় তার দোকানে। পেন, পেনসিল, স্লেট কিছুরই অভাব নেই। কিনে আনলেই হল।

ধারবাকিতে বাবা এখন দ্বিজপদর খদ্দের। বাবার ওপর আস্থাও খুব। ধারে যখন জিনিসপত্র আসছে তখন কুইনাইনই বা বাদ যায় কেন ! ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেশে ছিল, এখানে আছে কি না জানি না। বাবার এককথা, সাবধানে থাকা ভাল।

সেই বাবা, বাড়ি ফিরে দেখি নেই। এত সকালে কোথায় আবার গেলেন ! জঙ্গলে ঢুকে বসে থাকতে পারেন। আরও একটা গিনি যদি পান। বাবা কি তবে জঙ্গলেই খুঁজে পেয়েছেন গিনিটি ! আজকাল যে সুযোগ পেলেই জঙ্গলে ঢুকে যান, তাও লক্ষ করেছি। আসলে এই বনভূমির মহিমা বাবার কাছে অপার। গিনিটি সম্পর্কে বাবা-মা দু'জনেই মুখে কেমন কুলুপ এঁটে বসে আছেন। দশকান না হয়, সেজন্যও বাবা বারবার আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

বাড়িতে ছোট্ট উঠোন হয়েছে। দোপাটি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। ছাতিম, শিমুলগাছও আছে। মা কাঠকুটো ভেঙে বারান্দায় জড়ো করছেন। বারান্দায় বই খুলে বসে আছে দাদা। ঠাকুরঘরে মায়া। বনজঙ্গলে পাখপাখালিরাও উড়ে এসে দেখে যাচ্ছে বাবার বাড়িঘর। দুটো খরগোশ উঠোনের ওপর দিয়েই ছুটে পালাল। কাঠবিড়ালিরা এতদিন ভয়ে-ভয়ে ছিল। ইদানীং নির্ভাবনায় বারান্দা পর্যন্ত ধাওয়া করছে। জীবের কোনও অনিষ্ট বাবা সহ্য করতে পারেন না। এমনকী তাঁর লাগানো গাছের পাতা ছিঁড়লেও বাবা আমার কানটি টেনে বলবেন, "লাগে !"

"উঁহু, ছাড়ো। লাগছে।"

"তা হলে বুঝতে পারছ ?"

বাবা মানুষটি আমার গরিব হয়ে গেলেও সৌম্যকান্তি। তাঁর ক্রোধ জন্মালে মুখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। তাঁর কোনও কিছুতেই পরোয়া নেই। শুধু মায়ের কাছে বাবা জব্দ।

মাকেই বলা যায়। বাবার খবর মা ছাড়া কেউ বিশেষ দিতেও পারবেন না। জঙ্গলে ঢুকলেও অনুমতি, দ্বিজপদর দোকানে গেলেও অনুমতি, এমনকী যজন-যাজনে বের হলেও মায়ের অনুমতি প্রার্থনীয়।

উঠোনে শাবল, খোন্তা সবই আছে, বাবা যে আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন, উঠোনে শাবল, খোন্তা দেখেই টের পেলাম।

"বাবা কোথায় ?"

"তোমার বাবাই জানেন। আমি কী করে বলব !"

তা হলে সকালে উঠেই একচোট হয়ে গেছে। আমার পিতাঠাকুর সম্পর্কে মাকে এতটা নিস্পৃহ হতে কমই দেখেছি। হঠাৎ কী হল আবার !

দাদার মুখও গম্ভীর।

মায়া ঠাকুরঘর থেকে উঁকি দিয়ে বলল, "একবার যাবি দাদা ?"

"কোথায় ?"

"বাবা রেগেমেগে খালপাড়ের দিকে চলে গেল !"

"কেন গেল ? কী হয়েছে !"

একটা ঘেয়ো কুকুর কোত্থেকে হাজির। দাদা কুকুরটাকে মেরেছে। তাড়া খেয়ে কুকুরটা পালিয়েছে।

"কুকুর ! কখন ! দাদা, তুই কী রে ! বাবা ভাবতেই পারেন গেরস্তের বাড়ি, কুকুর-বেড়াল থাকবে না, হয় ? যখন এসে গেল, কেউ তো আসে না, বাবা ভাবতেই পারেন, এতে গেরস্তের মঙ্গল হয়। কুকুর-বেড়াল যাই আসুক, আমাদের কত বড় অতিথি তারা ! বাবার সব হয়ে গেছে, কুকুর-বেড়ালের দেখা নেই, —যাও এল তাড়িয়ে দিলি !"

বাবার কথা ভেবে আমার খুবই খারাপ লাগছিল। এমন জায়গায় বাড়ি যে, একটা কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত দেখা যায় না। মা তো বাবাকে অহরহ খোঁচা দিতে ছাড়েন না, "বাড়ি না ছাই, তোমার বাড়িতে কুকুর-বেড়ালও আসবে না। কোন এক তেপান্তরে এসে শেষে খুঁটি গাড়লে !"

দাদার ওপর খেপে গিয়ে বললাম, "তুই মারলি, মারতে পারলি ?"

মায়া তাড়া দিচ্ছে। "যা না দাদা। বাবা কি কুকুরটার সঙ্গে দৌড়ে পারবে ? তুই যা দাদা।"

মায়া একলাফে বের হয়ে এল। ঠাকুরের বাসনকোসন ধুতে হবে ভুলে গেল। বাড়ি হয়ে গেলে মানুষের কাজও বাড়ে। সকালে উঠেই যে যার কাজে লেগে যায়। দাদা পড়তে বসে, বাবা জঙ্গলে ঢুকে যান, মা রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন। ঠাকুরঘর লেপামোছা মায়ার কাজ। আমরা কেউ বসে থাকি না। বাড়ি করার মজাই আলাদা। এমন একটা সুন্দর সকাল দাদাটা স্বার্থপরের মতো নষ্ট করে দিল।

"এই নে দাদা।"

মায়া আমার হাতে দু'খানা রুটি ধরিয়ে দিল। কুকুরটাকে রুটির লোভ দেখিয়ে যেভাবেই হোক আটকাতে হবে।

রুটি হাতে নিয়ে ছুটছি।

কিছুটা যেতেই দেখছি, বাবা একটা গাছের নীচে বসে হাঁফাচ্ছেন।

বাবা আমাকে দেখেও যেন দেখলেন না।

"কুকুরটা কোনদিকে গেল ?"

বাবা বললেন, "দ্যাখো কোথায় গেছে। তার যাওয়ার কি জায়গার অভাব আছে ! তোমার বাবার মতো তাকে ভাবলে চলবে কেন !"

তা অবশ্য নেই। সামনে খোলা মাঠ। তারপর সড়ক। সড়কে সেই চিরাচরিত দৃশ্য। দুটো-একটা গোরুর গাড়ি ঝিমোতে-ঝিমোতে এগোচ্ছে। মানুষজনের দেখা পাওয়াই কঠিন ! মনসাতলায় গেলে কুকুর-বেড়ালের দেখা পাওয়া যায়। সেখানে মানুষজন আছে, পাটের আড়ত আছে। মনিহারি মুদিখানার দোকান আছে। বাবার ভাষায়, কী নেই ! কারণ মানুষজন না থাকলে কুকুর-বেড়ালই বা মরতে আসবে কেন ! আমরা যে মানুষজনের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম, সারমেয় উদয় হওয়ায় বাবা বোধ হয় তা টের পেয়েছিলেন। সে-সুযোগও দাদা হাতের কাছে পেয়ে নষ্ট করে দিল।

বাবা রুষ্ট হতেই পারেন।

"আপনি বাড়ি যান বাবা। আমি দেখছি।"

"কোথায় আর দেখবে !"

"আপনি বাড়ি না গেলে মা রাগ করবে।"

"তোমার মার রাগকে আমি থোড়াই পরোয়া করি। আমি বাড়িও যাব না, ভাতও খাব না। বামুনের বাক্য সরলে, পালন করতে হয়।"

আমি ডাকলাম, "তু তু।"

সাড়া নেই।

বাবাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, "আপনি যান, আমি কুকুরটাকে নিয়েই ফিরব।"

বাবা যেন কিঞ্চিৎ সাহস পেলেন। বললেন, "কুকুর হল মানুষের প্রিয় সঙ্গী। সেটা তোমরা বোঝো ! দাদা তোমার বোঝে ! তিনি বিদ্যাসাগর হবেন পড়ে। পড়া আর পড়া ! এ-বই নেই, সে-বই নেই। সবারই যেন সব কিছু থাকে ! একটা কুকুরকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। বাড়িঘরে থাকি না, কোথায় কবে ঘুরে মরি। বাড়িটা জঙ্গলের মধ্যে—একটা কুকুর থাকলে কত বড় ভরসা ! তাকে খেতে দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ?"

"সে হত না।"

হাতের রুটি দু'খানা হাওয়ায় তুলে দোলাতে থাকলাম। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, দু'পাশের জঙ্গলে যেখানেই দাদার মারের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকুক, ফের খাওয়ার লোভে ফিরে আসতে পারে।

"আর আসছে ! তোমার দাদা পরীক্ষা দিয়ে আমাকে উদ্ধার করবে ভাবছে ! তোমার মায়ের আশকারাতে সব আমার যেতে বসেছে ! কোথায় যে এখন খুঁজি ! ক্ষুধার্ত জীবকে এভাবে তাড়াতে হয় ! পাপ হবে না !"

রাস্তার দু'পাশে ধু-ধু মাঠ। মাঠের এখানে-সেখানে আকন্দ, সাঁইবাবলা, বৈঁচি, নিসিন্দার ঝোপঝাড়। উঁচু-নিচু মাঠের ঝোপঝাড়ে কোথাও কুকুরটা ঠিক লুকিয়ে আছে।

বাবা বললেন, "ছালবাকল ছাড়ানো প্রাগৈতিহাসিক দানবসদৃশ জায়গায় আমরা এসে উঠেছি। আবাদহীন পরিত্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে কুকুরটা কত বড় সম্বল, দাদা তোমার বুঝল না ! এমনিতেই

জায়গাটার অপবাদের শেষ নেই। ভুতির জঙ্গলে বাড়ি করেছি শুনলে আমার আপাদমস্তক লোকে দেখে। জলের দরে জমি বলেই তো এতটা জমি রাখতে পেরেছি। জায়গাটার মাপজোকও বিশেষ কিছু হয়নি। চৈত্র সংক্রান্তি আসতে-আসতে যতটা সাফ করতে পারি ততটাই আমাদের। এমন সুবর্ণ সুযোগ ক'টা মানুষের কপালে জোটে বলো! যাও একজন অতিথি এল, তাকেও তোমরা তাড়িয়ে দিলে!"

বাবার এই আফসোস টের পেলাম, যে করেই হোক কুকুরটাকে খুঁজে বের করতে হবে। কুকুরটাকে না নিয়ে যেতে পারলে বাবা আজ যে সত্যি অনশন করবেন! কী করি? আমি মাঠের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছি, আর হাত তুলে রুটি দেখাচ্ছি। যদি রুটির লোভে ঝোপঝাড় থেকে লেজ নাড়তে-নাড়তে বের হয়ে আসে!

বাবা তেমনই একটা ছাতিম গাছের নীচে বসে আছেন। ইতস্তত বড়-বড় তালগাছও আছে এদিকটায়। রাজারাজড়ার পতিত জমি। পড়ে আছে উরাট হয়ে। তার ভেতর বাবাকে খুবই অসহায় দেখাচ্ছিল।

বাবার জন্য আমার কেন এত কষ্ট হয়, বুঝি না! দেশ থেকে চলে আসার পর যা অবস্থা গেছে, কোনও স্টেশনে, না হয় কোনও পরিত্যক্ত মন্দিরে আমাদের অস্থায়ী আবাস ছিল এক সময়। বছরখানেক শুধু পোঁটলাপুঁটলি লটবহর নিয়ে এখানে- সেখানে ঘুরে মরা! একবার তো বাবা আমাদের একটা স্টেশনে ফেলে কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেলেন! মাসখানেক স্টেশনেই পড়ে থাকলাম। সবাই দুরছাই করে। আমরা কী খাই, কীভাবে দিন কাটে, কেউ ভাবে না। গাড়ি যায়-আসে, আমরা ছোটাছুটি করি গাড়ির জানলায়-দরজায়, যদি বাবা আমাদের গাড়ি থেকে নামেন!

সেই বাবা গাছের নীচে এভাবে বসে থাকলে কষ্ট না হয়ে পারে?

সেবারে বাবা গাড়িতেই ফিরেছিলেন, নামার সময় পোঁটলাপুঁটলির শেষ ছিল না। কোথায় কার আদ্যশ্রাদ্ধ করে কোরা কাপড়, চাল, ডাল, তেল, সিঁদুর, টাকা-পয়সা নিয়ে উদয় হয়েছিলেন। বাবার কথায়, দানছত্র— তা দানছত্র না হলে, কোরা থান, লালপেড়ে শাড়ি, কাঁসার থালা-বাসন, জামবাটি কত কিছু যে বাবা যত্ন করে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। চাল, ডাল, তেল, নুন ছিল না পুঁটলিতে। খবর পেয়ে চলে গিয়েছিলেন। ঘোরাঘুরি করে দেশের কিছু লোকজনের ঠিকানাও পান। সব সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর দেরি হয়ে গেছে।

সেই বাবাকে কী করে বোঝাই, কুকুরটা যখন এ-তল্লাটে ঢুকে গেছে, ঠিক আবার ফিরে আসবেই। কুকুর তাড়া খেয়ে বেশিদূর যেতে পারে না। মানুষের মুখ না দেখে কুকুর থাকতে পারে না। মনসাতলা পর্যন্ত এত রোদে যাওয়াও কুকুরটার কঠিন। সেখানে না গেলে মানুষজনের মুখই বা দেখতে পাবে কোথায়!

দূর থেকেই মনে হল, বাবা আমাকে ডাকছেন।

"যাই!" বলে ছুট লাগালাম।

আর গিয়ে যা দেখলাম, বাবার পায়ের কাছে কুকুরটা দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। বাবাকে ঠিক চিনতে পেরেছে। বাবার কী আহ্লাদ।

"দে, দে। রুটি দুটো দে।"

আমাকে দেখে ভালমানুষ বলে বোধ হয় বিশ্বাস হল না কুকুরটার।

ঘেউ-ঘেউ।

যাক, অনেকদিন পর একটি কুকুরের ডাক শোনা গেল।

পকেট থেকে রুটি দুটো বের করে দিলে আমার পায়ের কাছেও গড় হল। লেজ নাড়ল। তারপর খপ করে দুটো রুটিই গিলে ফেলল। আমরা হাঁটা দিলাম।

কুকুরটা পেছনে। বারবার পেছন ফিরে তাকাতে বাবা নিষেধ

করে দিলেন। এতে কুকুরের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। বিশ্বাস যখন জন্মেছে, তখন আর ভাবনা নেই।

যেতে-যেতেই বাবা বললেন, "কুকুরটার শরীরে দেখছি কিছু নেই। সেবাযত্ন দরকার। তুমি দৌড়ে গিয়ে জননীকে সামান্য হলুদ-চুন গরম করতে বলো। তাঁর মেজাজ প্রসন্ন থাকলে বলবে। না থাকলে মায়াকে ডেকে চুপিচুপি বলবে। কুকুরটাকে যে শেষপর্যন্ত পাওয়া গেছে, সেটা তোমাদের পক্ষে কত বড় সৌভাগ্য তোমরা জানো না। আর তোমার জননী তো স্বামী-সন্তান ছাড়া কিছু বোঝেন না। বুঝিয়েও লাভ নেই। যে যা বোঝে।"

অনেকটা রাস্তা ছুটে এসে হাঁপিয়ে পড়েছি। মায়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, "মা, দাদা এসেছে।"

আর সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম মাও বের হয়ে এসেছেন।

"তোমার বাবা কোথায় ?"

"আসছেন।"

"কুকুরটার খোঁজ পেলে ?"

"পেয়েছি। আসছে।"

দাদাও বের হয়ে এসেছে ঘর থেকে।

বেশ বেলা হয়ে গেছে বোঝা যায়। সকালের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে, বেলা বাড়লে সূর্যের তেজ বাড়ে। রোদে দাঁড়ানো যায় না। বাবার মতো দেখতে আমরাও এক-একজন কার্তিকঠাকুর। রোদে ঘুরে মুখ লাল হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে ছাতিম, শাল, শিশুগাছের ছড়াছড়ি। ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়েও টের পেলাম খুবই জলতেষ্টা পেয়েছে।

"বাবা কোথায় ?" দাদারও একই প্রশ্ন।

"বললাম তো, আসছে।"

তা হলে আমার বাবার জন্য সবারই চিন্তা হয় ! ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল।

কেউ আর রাস্তা থেকে নড়ছে না। বাবাকে না দেখা পর্যন্ত শান্তি নেই বুঝি !

বাবার খোঁজে এবং কুকুরটার খোঁজেই যেন দাদা আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। সামনে যতদূর চোখ যায় বিশাল ব্যাপ্ত আকাশ। কিছুক্ষণ বাদে বাবা এবং কুকুরটি উভয়েই আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। মাথার ওপরে আকাশ এবং নিথর গাছপালা দাঁড়িয়ে। আকাশের এমন ব্যাপক উদাসীনতা কখনও আমি প্রত্যক্ষ করিনি। আমার বাবা ফিরছেন। পায়ে-পায়ে কুকুরটাও ফিরছে। আকাশের এই বিভূতির মধ্যেই কেমন অচেনা এক ডাক ভেসে আসে।

মায়া বাবার কাছে ছুটে যেতে চেয়েছিল। বললাম, "আগে তুই চুন-হলুদ গরম কর। চুন-হলুদ গরম না হলে বাবা এসে কিন্তু রেগে যাবে।"

মা বললেন, "ও কি পারবে ? আমিই যাই।"

বাবা ফিরে আসায় মা যে খুবই প্রসন্ন, টের পেলাম। কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার এই ফেরা— কোনও স্বর্গারোহণের দৃশ্য যদি মা টের পেয়ে থাকেন, কুকুরটা যে যমরাজ নয় কে বলবে ! রামায়ণ-মহাভারতের দেশ থেকে আমার বাবা উঠে আসছেন যেন ! আমার বাবা ফিরছেন, সঙ্গে ধর্মরাজ। গরিব বামুনের ঘরবাড়িতে এটা যে কতবড় খবর, বাবার মুখ দেখে টের পেলাম। বাড়িটা এতদিনেও বাড়ি মনে হচ্ছে কি না বাবার বোধ হয় সংশয় ছিল। ধর্মরাজ এসে যাওয়ায় বাবার সেই সংশয় আর থাকল না।

॥ ৩ ॥

সাঁঝ লাগলে মা বারান্দায় হারিকেন জ্বালিয়ে দিলেন। বাবার কিছু জীর্ণ পুঁথি আছে। এ-সময়টায় তিনি তাঁর পুঁথি পড়েন, আমাদের কাউকে তাঁর পুঁথি ধরতে দেন না। একটা থান কাপড়ে বাঁধা থাকে তাঁর সব পুঁথি, পুরনো পঞ্জিকা, চণ্ডীস্তোত্র, সামবেদ, হরিবংশ, একটি রুদ্রাক্ষের মালা এবং একটি গীতা। বাবা শুদ্ধ বস্ত্রে তাঁর পুঁথির পুঁটুলি খুলে 'হরিবংশ' বইটি জলচৌকিতে মেলে ধরার আগে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে নিলেন। আজ মনে হল হরিবংশ তিনি পড়বেন।

মায়া ধূপবাতি দিচ্ছিল ঘরে-ঘরে।

জঙ্গলে অন্ধকার নেমে আসছে।

মা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছেন।

একটা গোখরো সাপ উঠোনের ওপর দিয়ে চলে গেল।

মায়া 'সাপ' বলে চিৎকার করতেই বাবার ধমক, "সাপ কী ! আস্তিক বলতে হয়।"

জঙ্গলে জোনাকি পোকা জ্বলছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছি। পাখির কলরব এবং জন্তু-জানোয়ারের চলাফেরার শব্দও কানে আসছে। ধর্মরাজ বাবার পাশে গুটিয়ে শুয়ে আছে। তাঁর স্নান, সেবা, পরিচর্যা একটু বেশিমাত্রায় হয়ে গেছে বলে তিনি নিদ্রাভিভূত।

বাবা কাকে যে উপলক্ষ করে কথাগুলি বললেন, বোঝা গেল না।

বললেন, "এভাবেই কোনও জনপদ গড়ে ওঠে। আবার তা ধ্বংস হয়েও যায়। মানুষের তো বসে থাকার সময় নেই। তাকে কর্ম করে যেতেই হবে। গুপ্তধনও মানুষই পায়। ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে একটি গিনি পাওয়া গেছে, ঠাকুরেরই দয়ায়।" বলেই তিনি চোখ বুজে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ সামান্য উন্মীলন করে আবার বলতে শুরু করলেন, "ঠাকুরের অশেষ কৃপা থাকলে সব হয়।"

তারপর আবার থেমে বললেন, "একদা বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সেকালে বারাণসীর কাছে কোনও গ্রামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের এমনই গুণ ছিল, তিথি-নক্ষত্রের যোগে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি যদি মন্ত্রপাঠ করতেন, আকাশ থেকে একসঙ্গে সোনা, রূপা, মণি, বৈদূর্য, হীরক—সব রত্ন ঝরঝর করে পড়তে থাকত। ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে একটি গিনি পাওয়া খুব একটা অচিন্তনীয় ঘটনা নয়, মনে রাখবে।"

বাবার এমন সব ঈশ্বরসদৃশ কথাবার্তা মা আমল দেন না। মা শুনছেন কি না জানি না। আমাদের উপলক্ষ করে জননীর উদ্দেশেই যে সব কথা বাবার, তাও আমরা জানি। পদে-পদে বাবাকে হেনস্থা করতে পারলে মা বাঁচেন। কখন না মা রান্নাঘর থেকে ফোড়ন কেটে বলেন, 'তোমার বাবাকে এবারে থামতে বলো। আর উপদেশ ঝাড়তে হবে না। যার এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব তার মুখে কোনও ধর্মকথাই শোভা পায় না।'

না, জননী আজ সত্যিই বাবার ওপর প্রসন্ন। একেবারে দরজার কাছে ছুটে এসেছেন। বারান্দায় বাবা। হারিকেনের আলো আর বাবার সামনে হরিবংশ বইটি খোলা।

মা দরজায় ঝুঁকে বললেন, "তারপর ?"

বাবা চোখ তুলে জননীর মুখ দেখলেন। হারিকেনের আলোতে মায়ের মুখও উদ্ভাসিত। জননী 'তারপর' বলায় বাবা অভিভূত।

বাবা একজন শ্রেষ্ঠ নরপতির মতো হাঁটু ঝাঁকাতে থাকলেন। "তারপর ? তারপরের তো শেষ নেই।" বিজ্ঞজনের মতো বাবা হয়তো মাকে এমনই বলতে পারেন। বাবার মুখ দেখে আমার এমনই মনে হল।

কিন্তু বাবা তদ্গতচিত্তে বললেন, "ইচ্ছাময়ী তাঁর করুণা অসীম। তারপর বোধিসত্ত্ব সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কথা শুনে তাঁর

শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তুমি আমায় বুঝেও বোঝো না !"

আমাদের দোষ বা গুণ যাই বলা যাক, বাবার কল্যাণে পুরনো পুঁথি থেকে আমরা অনেক খবর পেয়ে যাই। সব কাজেই বাবার নানা উপমা, কোথায় কবে কুরুক্ষেত্র, কেন কুরুক্ষেত্র, কেন ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ থাকতেও অভিমন্যু বধ হয়, তার ব্যাখ্যা বাবার মুখেই শোনা। বোধিসত্বকে তাও আমরা জানি। গুরুবংশ হলে যা হয় ! অবস্থাবিপাকে জঙ্গলে এসে উঠলেও রক্তে দোষটা থেকে গেছে। বোধিসত্ব কে, এমন প্রশ্ন করলে মূর্খ বলে বাবা তিরস্কার করতেই পারেন।

গিনিটি নিয়ে বাবাকে আমরা যে কম উত্যক্ত করিনি তাও নয়। বাবার এক কথা, "দেশটার কথা ভাববে, তার ইতিহাসের কথা ভাববে। মহাজ্ঞানী মহাজনের দেশ এটা। একটা সামান্য গিনি, ঠাকুরের ঘরে পাওয়ায় তোমরা এত বিচলিত বোধ করছ কেন বুঝি না ! যুগের প্রভাবে আমরা সব হারিয়েছি, তা না হলে তোমার বাবার এমন দশা হয় ?" তারপরই বাবা মন দিয়ে হরিবংশ বইটি পড়তে শুরু করে দিলেন। আমরা এখন যে যার জায়গায়। বোধ হয় বারান্দায় কুকুরটি বাবার একমাত্র অনুগত শ্রোতা। ধর্মরাজকে শ্রোতা পেয়ে বাবার তেজ বেড়ে গেছে। বেশ জোরে-জোরেই হরিবংশ পাঠ করছিলেন।

ওপাশের বারান্দায় দাদা আর-একটা হারিকেনের আলোয় পড়ছিল। বাবার হরিবংশ পাঠে দাদার পড়ার বিঘ্ন ঘটছে। দাদা এতে যথেষ্ট ক্ষিপ্ত হতেই পারে। বই ফেলে মায়ের কাছে ছুটে গেল। "আজ হয়ে গেল ! পড়ার বারোটা বাজল। মা দয়া করে তোমার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণটিকে আস্তে পাঠ করতে বলো। আমার পড়াশোনা নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা আছে ?"

"চিন্তা তাঁর ঠিকই আছে। পারছে না, কী করবে বল। তবু তো কিছু হচ্ছে। তিনি না থাকলে এটুকু কোথায় পেতিস ? শেষে আর-একটা হারিকেনও তিনি কিনে এনেছেন। তোর পড়ার অসুবিধের কথা ভেবেই তো এনেছেন। কতক্ষণ আর পড়বে ! সন্ধ্যাআহ্নিক আছে না ! ঠাকুরের বৈকালি আছে না !"

বাবার প্রতি মাকে সবসময় রুষ্ট থাকতেই দেখেছি। আজ এটা কী হল ! তবে মাও কি বিশ্বাস করেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো বাবাও তিথি-নক্ষত্র যোগে মন্ত্রোচ্চারণে গিনিটি লাভ করেছেন। ইচ্ছে করলে তিনিও কি একদিন আকাশ থেকে একসঙ্গে সোনা, রূপা, মণি, বৈদূর্য, হীরক এইসব রত্ন ঝরঝর করে নামিয়ে আনবেন ! আমাদের অভাব থাকবে না, নতুন এক জনপদ তৈরি হবে। গাছপালা বৃক্ষ মিলে আমাদের এই একখণ্ড জমি যতই দুর্গম হোক, একদিন জননীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কৃপায় তা সুগম হয়ে উঠবে।

অন্য সময় হলে আমিই হয়তো বাবাকে তাড়া দিতাম, "এত জোরে পড়বেন না, আস্তে পড়ুন। দাদার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে।"

বাবা হয়তো কুপিত হতেন, কিছু ঠিক ভাবতেন, আমার দিকে তাকাতেন, কিংবা একটু উদাস হয়ে বলতেন, "নিশ্চয়ই, তোমার জননীর এটা ইচ্ছে।"

কারণ বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না, তাঁর ইচ্ছাময়ী আমাদের উসকে না দিলে মুখের ওপর কথা বলতে পারি, এত সাহস আমাদের অন্তত নেই। দাদার পড়ার যতই বিঘ্ন ঘটুক বাবাকে নিরস্ত করার এতটুকু জোর আজ আমি পেলাম না। বাবা বইটি বন্ধ করে মাথায় ঠেকালেন। রোজকার মতো আজও বললেন, "হরিবংশ পাঠে, শ্রবণে, কীর্তনে, দানে, বিতরণে পুণ্য হয়।"

যেন এই বাড়িঘরে বাবা সব অমঙ্গল দূর করে দেওয়ার জন্যই হরিবংশ পাঠ করছেন। আমরা ভাল থাকলে আমাদের জননী ভাল থাকবেন। বাবা ভাল থাকবেন। এতে দাদার পড়ার কতটুকু ক্ষতি হল বাবার মাথাতেই নেই। বললেও তিনি শুনবেন না। আর তখনই দেখি একজন কিম্ভূতকিমাকার লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় লোকটিকে দেখেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত। আর্তনাদ, "বাবা উঠোনে একটা লোক !"

বাবা নিমেষে চিৎকার করে উঠলেন, "কে ? কে ! কোথায় লোক !"

লোকটি পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। অসুরের মতো দেখতে। ঝাঁকড়া চুল, গায়ে ফতুয়া, হাফপ্যান্ট পরা—মা, দাদা, মায়া ভয়ে কাঠ। বাবা উঠোনে নেমে গেলেন হারিকেন হাতে। কিন্তু কোনও খোঁজাখুঁজি করলেন না। শুধু বললেন, "ও কিছু না। তোমাদের চোখের ভুল। আপাতত চোর-ডাকাতের উপদ্রবের কোনও কারণ আছে বলে মনে করি না।"

মা বললেন, "জলজ্যান্ত লোকটা উঠোনে দাঁড়িয়ে, তুমি বলছ আপাতত চোর-ডাকাতের উপদ্রবের কোনও কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না ! পিলু দেখল, আমিও দেখলাম ! লোকটা চালতে গাছের ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল !"

"তা হলে যাই।" বাবা হারিকেন হাতে উঠোন থেকে জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে যাওয়ার সময় যেন না বলে পারলেন না, "সবাই আমার চেয়ে বেশি বোঝে ! চোর-ডাকাত দেখলে ধর্মরাজ স্থির থাকতে পারত ! ঘাড় মটকে দিত না !"

একজন সদ্য-আসা অতিথি সম্পর্কে সমালোচনাও করা যায় না।

সঙ্গে-সঙ্গে বাবার হুঙ্কার উঠতেই পারে, "আসতে-না-আসতেই পেছনে লাগলে !"

ধর্মরাজের বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। তিনি বারান্দায় শুয়ে ছিলেন, এখনও আছেন, কখন আড়মোড়া ভাঙবেন তিনিই জানেন।

দাদা তাড়া লাগাল, "এই ওঠ। ওঠ বলছি।"

পিটপিট করে দু'বার চোখ মেলে তাকাল শুধু।

আমার কেন যে রাগ ধরে গেল ! জঙ্গলটা তো ভাল না। বাবা জঙ্গলে জ্যোৎস্নায় বনদেবী পর্যন্ত দর্শন করেছেন, উঠোনে নেমে তু করতেই লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল কুকুরটা। বাবার সঙ্গে আমারও যাওয়া দরকার। দাদা ভয়ে বাইরে আসছে না।

মা বললেন, "তুই চালতেগাছের দিকটায় দ্যাখ।"

মা জানেন আমার বেজায় সাহস। পায়ে-পায়ে কুকুরটা থাকায় সাহস এখন তুঙ্গে। চেঁচামেচি করে লাভ নেই। আমাদের চেঁচামেচি গাছপালা জঙ্গল বাদে কারও শোনারও কথা নয়।

হঠাৎ দেখি মা চেঁচাচ্ছেন।

"আর যেতে হবে না। তোমার বাবাকে ডাকো। তিনি তো সত্যি দেখছি ডাকাত ধরতে জঙ্গলে ঢুকে গেলেন ! আমি কি বলেছি একা যেতে ! এই বিলু, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ? যাও, তোমার বাবাকে চলে আসতে বলো। ডাকাত ধরে তোমার বাবাকে আর বীরত্ব না দেখালেও চলবে।"

বাবা যে সত্যি পুকুরের ওদিকটায় চলে গেলেন ! গাছপালার ফাঁকে আলোও দেখা যাচ্ছে না। তারপর তো শুধু বিশাল শিরীষ, ছাতিম আর শালের জঙ্গল ! কচুলতায় ছেয়ে আছে সব আগাছা। দ্রোণ ফুলের গাছগুলোয় সকাল হলে ফুল ফুটে থাকে। বেশ একটা বড় টিলার মতো জায়গা। ওখানে গেলেই কেন যে মনে হয় এই টিলার নীচেই আছে কোনও রাজার গুপ্ত সিংহাসন ! তারপর আর যাওয়ার সাহস হয়নি, দিনের বেলাতেই গা-ছমছম। চারপাশে অজস্র গাছপালা, মধ্যিখানটায় ফুলের এই সমারোহ, আর টিলার ভেতর অজস্র গর্ত। গর্তের মুখে সাপের লেজ দেখে বাবার কাছে সেদিন ছুটে এসেছিলাম, সব শুনে বাবা বলেছিলেন গম্ভীর গলায়, "ও কিছু না। আমার ছেলে না তোমরা ? সাপের লেজ দেখেই ছুটে এসেছ ! এটা কোনও খবর হল ! টিলাটা দেখে

বুঝলে না, কারা ওখানটায় থাকতে পারেন! মুনি-ঋষির বংশ তারা। কশ্যপ মুনির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ! এত বলি আমি যখন পাঠ করি..."

মা বাবাকে শেষপর্যন্ত নিরস্ত করেছিলেন, "মুনি-ঋষির গপ্পো পরে শুনবি। আগে গোরুটা মাঠে দিয়ে আয় পিলু।"

বাবা রুষ্টমুখে মায়ের দিকে কটমট করে তাকিয়েছিলেন শুধু, মা বাবাকে কেন যে গ্রাহ্য করেন না! তিনি পুত্রদের সৎ উপদেশ দিলেই মা ক্ষিপ্ত হয়ে যান।

দীর্ঘনিশ্বাস বাবার।

"সংসারে ধর্ম না থাকলে যে সব যায় দয়াময়ী!"

সেই বাবা সব কিছু অগ্রাহ্য করে এতটা ভেতরে ঢুকে গেলেন! হারিকেনের আলোও চোখে পড়ছে না। জ্যোৎস্নায় শুধু কীটপতঙ্গের আওয়াজ। সরসর শব্দ। অনেক দূরে রেলগাড়ির ঝিকঝিক, চারপাশ এত নিঝুম যে, আমাদের এমন অসময়ে ডাকাতের পিছু ধাওয়া করা পিতৃদেবের খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে। বাবা তো ঠিকই বলেছেন, আপাতত চোর-ডাকাতেরও উপদ্রবের কোনও কারণ দেখছি না। আছেটা কী যে, নেবে! ক'খানা থালাবাসন, সে তো একজন চোরের পক্ষেই যথেষ্ট। ডাকাতির কী দরকার?

যা হয় আমার, বাবার বিপদ দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। ডাকাতদের খুব মাথাগরম হয়, যদি পেটে-পিঠে ছুরি বসিয়ে পালায়! মায়ের চোপার আতঙ্কেই বাবা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন। চোখের ভুল মা মানতে রাজি না।

এখন বোঝো!

মা এখন রাগে আমাদের বকাঝকা করতে শুরু করেছেন। "আরে তোরা দাঁড়িয়ে থাকলি! যা, হারিকেন নিয়ে। কোথায় গেল মানুষটা? তাঁর কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে!"

মা উঠোনে নেমে জঙ্গলের দিকটায় হেঁটে গেলেন কিছুটা।

বিড়বিড় করে বকছেন, "কী যে করি! আমার হয়েছে যত জ্বালা। ওরে শকুনের পাল, তোরা কি দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবি? মানুষটা একা জঙ্গলে ঢুকে গেল ডাকাত ধরতে, তোরা আছিস কী করতে! মরতে পারিস না!"

রেগেমেগে বললাম, "তাই মরব। কে বলেছিল, জলজ্যান্ত মানুষটা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে! কে বলেছিল, আমি দেখলাম, পিলু দেখল, তুমি বলছ চোখের ভুল! কে বলেছিল! এখন যত দোষ আমাদের!"

দাদা বলল, "গেছে যখন, আসবে। আমার পড়া আছে। আমি যেতে পারব না।"

মাকে নিরস্ত করা দরকার। এত রাতে মা জঙ্গলে ঢুকে গেলে বের হয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পাবেন না। তা হলে আর-এক কেলেঙ্কারি, বাবাকে খুঁজতে মা গেলেন, মাকে খুঁজতে পুত্র গেল, কেউ আর ফিরল না, বাবার উপদেশামৃতের মধ্যে এমন গল্পও আমি শুনেছি।

একটা জঙ্গল একটা পরিবারকে এভাবে গিলে ফেলল! বাবার পুঁথিতে এমন অনেক কিসিমের গপ্পো আছে। পুস্তকে লেখা থাকলে মিছে কথা হয় না, শুধু বাবার কেন আমাদেরও বিশ্বাস। মুনি-ঋষিদের কোপে পড়ে গেলে সব হয়। জল, জঙ্গল, পাহাড় শুধু কেন, সমুদ্দুরেরও নিস্তার থাকে না। অগস্ত্য মুনি তো একটা আস্ত সমুদ্রই গিলে ফেলেছিলেন রাগ করে। বিন্ধ্য পর্বতেরও নিস্তার ছিল না। হেঁট হয়ে গড় করল মুনিকে, ব্যস, হয়ে গেল। আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না।

ইল্বল-বাতাপি দু'ভাইয়ের গল্পও বাদ যেত না। আসলে এইসব মুনি-ঋষিদের গল্প বলে সংসারে একজন গরিব বামুনের কত গুরুত্ব, তাই বোধ হয় আমাদের বোঝাতে চাইতেন বাবা। মুনি-ঋষিরা তো সবাই গরিব ব্রাহ্মণ। বাবা তাঁদের জ্ঞাতি ভ্রাতা, সোজা কথা?

ডাকলাম, "মা, আমি যাচ্ছি। তুমি যাবে না?"

আকন্দ ঝোপঝাড়ের কাছে মা দাঁড়িয়ে।

আশ্চর্য, বাবার ধর্মরাজের পর্যন্ত সাড়া নেই। বাড়িতে চোর-ডাকাত এলে তাড়া করবে না, হয়? এ কেমন কুকুর রে বাবা! তবে কুকুরটা বাবার পিছু-পিছু বোধ হয় জঙ্গলে ঢুকে গেছে।

দেখছি মায়াও আমার পিছু-পিছু আসছে।

"এই, বাড়ি যা।"

"একা ভয় করছে।"

তা ভয় করারই কথা। এত বড় একটা ঘটনা, কেউ নেই যে বলব, দেখুন আমার বাবা কখন ডাকাতের খোঁজে জঙ্গলে ঢুকে গেল, আর ফিরছে না। জ্যোৎস্না রাত। কার্তিকের শেষাশেষি বলে হিম পড়ছে। বাড়িটা থেকে সামান্য এদিক-ওদিক গেলেই আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এত ঘন গাছপালা যে, বাড়িঘর সব সহজেই চোখের ওপর অদৃশ্য হয়ে যায়। গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে যে একজন গরিব ব্রাহ্মণ বাড়িঘর করে বসবাস করছে, তখন বিশ্বাসই হয় না। রাতে আলো জ্বালা থাকে বলে, জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেলেও বোঝা যায়, বাড়িটা কাছেই আছে। আলো নিভে গেলেই মুশকিল, তখন ডাকাডাকি সার।

"ও দাদা রে!"

"ও মায়া রে!"

সেই মায়াও সঙ্গে যাবে বলে পিছু নিয়েছে।

"না, তুমি যাবে না। দাদা বাড়িতে একা। সবাই গেলে চলবে কেন? দাদা ভয় পাবে।"

মায়া কিছুতেই থাকতে রাজি না। অগত্যা বললাম, "আয়।"

মা আকন্দঝোপের পাশে দাঁড়িয়েই ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছেন।

আকন্দঝোপ পর্যন্তই যাওয়া যায়। পুকুরটা আকন্দঝোপের পাশেই। আপাতত আমাদের বাড়ির সীমানা ওখানেই শেষ। গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভেতর পুকুরটা। জরাজীর্ণ একটা ঘাটলাও আছে। দু'পাশের কাঁটাঝোপ কেটে বাবা পুকুরে যাওয়ার জন্য একটা সরু রাস্তা বের করে দিয়েছেন। মা যে সেখানে দাঁড়িয়েই আছেন দূর থেকেও বোঝা যায়। ভেতরে আর যাওয়ার সাহস নেই। চোর-ডাকাত না হোক, জলজ্যান্ত আমার বাবা সেখানে যে নেই, মায়ের ডাকাডাকিতেই বোঝা যায়। খুবই ম্রিয়মাণ আমি।

কাছে গিয়ে ডাকলাম, "বাবা, আপনি আমাদের ফেলে কোথায় ডুব মারলেন!"

মায়ের কাতর গলা, "ওগো শুনছ, এত রাতে আর চোর-ডাকাত ধরে কাজ নেই। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কখন খাবে, কখন ঠাকুর বৈকালি দেবে? তুমি গেলে কোথায়?"

বাবার এই একটা দোষ, কোথাও গেলে আর ফিরতে চান না। বাবার সঙ্গে দ্বিজপদর দোকানে গেলে এটা আরও বেশি টের পাই। গায়ে পড়ে আলাপ করায় বাবার জুড়ি পাওয়া কঠিন। বংশ উদ্ধার না করে ছাড়েন না। "আপনার নিবাস? পিতার নাম? পুত্রসন্তান ক'টি? কী করা হয়?" এইসব বিবিধ প্রকারের প্রশ্ন বাবা অনায়াসেই একের পর এক করে যেতে পারেন। বামুন মানুষ, উপবীতধারী, গায়ে নামাবলি—এতসবের ভরসাতেই বাবা বোধ হয় অকুণ্ঠচিত্তে এমন সব প্রশ্ন করতে পারেন। লোকটি বিরক্ত হতে পারে এটা বাবার মনে আদৌ আসে না। আর অবাক না হয়েও পারি না, লোকটি যখন বাবাকে গড় হয়, এবং তস্য বাড়ির কোনও পূজাপাঠে বাবাকে ডেকেও পাঠায়।

কিন্তু এই ঘন বনভূমিতে বাবা কাকে আবার পাকড়ালেন! বিশাল সব বৃক্ষ ছাড়া সম্বল বলতেও তো কিছু নেই। হারিকেনও

জ্বলছে না। এমন একজন মানুষ যদি জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে যায় আমরা কী করি! মায়ের কাতর গলা, প্রায় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে, নিজেকেই দোষারোপ করছেন মা।

"আমায় যে কী শনিতে পেয়েছিল, কেন যে তোমার বাবাকে বলতে গেলাম, তাই বলে এতটা সাহস দেখানো কি ভাল? তোমার বাবাকে জোরে ডাকতে পারছ না!"

"জোরেই তো ডাকছি।"

কুকুরটা যদি বাবার কাছে থাকে, বাবা সাড়া না দিলেও কুকুরটা সাড়া দিতে পারে।

"ধর্মরাজ, তুমি কোথায়!"

মা অগত্যা যেন না বলে পারলেন না, "কুকুর কি ধর্মরাজ বোঝে? তোমরা দেখছি সবাই বাবার মতিগতি পেয়েছ! বিলুটা তবু এসবে থাকে না। থাকলে সোনায় সোহাগা তোমাদের।"

তাই তো! কুকুর ধর্মরাজ বুঝবে কেন।

সঙ্গে-সঙ্গে "আ তু তু।"

আর কুকুরের সেই ঘেউ-ঘেউ শব্দ। সমস্ত গাছপালা কাঁপিয়ে—জঙ্গলের সব লতাপাতা বিদীর্ণ করে ছুটে আসছে কুকুরটা। এসেই মায়ের পায়ে গড়াগড়ি খেলে মা বললেন, "উনি কোথায়! কোথায় রেখে এলে তাঁকে।"

বাবার সাড়া পাওয়া গেল, "যাচ্ছি। তোমাদের জ্বালায় দু'দণ্ডেরও কী শান্তি আছে আমার! দিলে তো সব মাটি করে!"

জঙ্গলের ভেতর থেকেই বাবা সাড়া দিচ্ছেন। ঝোপঝাড় সরিয়ে বাবা বের হয়ে আসছেন।

"আপনার হারিকেন কোথায়?"

"হাওয়ায় নিভে গেছে।"

"নিভে গেছে তো ওখানে এতক্ষণ ধরে কী করছেন?"

বাবার শরীরে, মাথায় শুকনো পাতা, মাকড়সার জাল সব আটকে আছে। এ-বাবাকে আমরা চিনি—জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেই, মুখে, মাথায়, শরীরে গাছপাতা আটকে থাকে। কাছে আসায় মা পাতা, খড় সব বাছতে শুরু করে দিলেন। ফিরে এসেছেন এই ভাগ্য, আর কোনও অভিযোগ নেই তাঁর।

আমি বিরক্ত হয়ে না বলে পারলাম না, "বাবা, আপনি কি আবার অন্তর্ধানের মতলবে আছেন?"

"হ্যাঁ, তাই আছি! একটু বাড়িছাড়া হয়েছি, ত্রাহি মধুসূদন শুরু হয়ে গেল! কেন, কী হয়েছে, এতে অন্তর্ধানের কী দেখলে! তোমার জননী তো আমাকে ছাড়া সবাইকে চোর-ডাকাত ভাবেন। ডাকাত-ডাকাত বলে চিৎকার করতেই আদিনাথ বেকুফ হয়ে গেল।"

"কর্তা, আমি ডাকাত না, আদিনাথ। জঙ্গলেই থাকি। আপনার প্রতিবেশী। আলোটা নিভে যাওয়ায় প্রতিবেশীর মুখটা পর্যন্ত দেখা গেল না। ডাকাডাকি করলাম, ওরে একটা আলো দিয়ে যা—কেউ তোমরা সাড়া দিলে না। এই তো আমার পরিস্থিতি। আদিনাথ কী না ভাবল!"

তা হলে লোকটা আর ডাকাত নেই! বাবার আদিনাথ শুধু আদিনাথও নয়, বাবার প্রতিবেশী।

বাবা খুবই হৃষ্ট মন নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। কুকুরটা দৌড়ে আগে-আগে চলে গেল। বাবার হাতে হারিকেন। মা, মায়া সবাই ফিরছে। তবে মা খুবই বিপাকে পড়ে গেছেন বোঝা যায়। ঝড় ওঠার আগের মতো মা থম মেরে আছেন। মা যে লোকটিকে তবে সত্যি দেখেছেন! আমিও দেখেছি! দেখে তাকে কোনও কারণেই মনে হয়নি সে আমাদের প্রতিবেশী হতে পারে। প্রতিবেশী হলে এতদিন কোথায় ছিল? জঙ্গলে থাকে কী করে! তার ঘরবাড়ি থাকবে না! দুর্গম এই অরণ্যভূমিতে বাবা ছাড়া আর কেউ ঘরবাড়ি করে থাকতে পারে, মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে

পারছেন না।

তারপরও হাজার কথা, প্রতিবেশী হলে ছুটে পালাল কেন! রাত করেই বা উদয় কেন! চেহারাটা দস্যুর মতো। সেই লোকটা আদিনাথ এবং প্রতিবেশী—মা কেন জানি ভাল বুঝলেন না।

বাবা বাড়ি ফিরে বালতির জলে হাত-মুখ ধুলেন। সারা গায়ে জল ছিটাবার সময় বললেন, "ওঁ নমঃ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।" তারপর খড়ম পায়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। পেতলের সিংহাসনে একটি নারায়ণ শিলা, কাঠের সিংহাসনে অষ্টধাতুর রাধাগোবিন্দর মূর্তি। ফুল-বেলপাতায় ভর্তি। সব সরিয়ে ঠাকুরের শয্যা পাতলেন। তারপর ধূপ-দীপ জ্বাললেন, ঘণ্টা, কাঁসর, শঙ্খ সব নিয়মিত যেভাবে বাজে, বাজল। শেষে শেকল তুলে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমাদের সবার মাথায় ফুল-বেলপাতা ছোঁয়ালেন। হাতে বৈকালির প্রসাদ-বাতাসা দিলেন—এই পর্যন্ত মোটামুটি শান্তিতেই কেটে গেল।

বাবা খেতে বসলেও মা কোনও কথা বললেন না।

আমরাও খেতে বসেছি। কুকুরটা উঠোনে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া দেখছে। মুসুর ডাল, বেগুনভাজা আর বনআলুর ডালনা। খুবই মুখরোচক খাবার। আমরা বেশ তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছি। বাবাও চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন। মা মাঝে-মাঝে যে বাবাকে আড়চোখে দেখছেন তাও টের পেলাম। কিন্তু কোনও রা করছেন না। কারণ মা জানেন, এই আদিনাথ-অভিযানের গল্পটি বাবার অনেকদিন চলবে।

আমি আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বললাম, "আদিনাথকে নিয়ে বাড়ি চলে এলেই পারতেন। জঙ্গলে বসে থাকলেন, আমাদের চিন্তা হয় না!"

"চিন্তা! চিন্তা কেন! বাড়িতে বিগ্রহ আছে, তোমাদের চিন্তা করার কে অধিকার দিল!"

বাবার খাওয়া শেষ। মার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

"তাই বলে হারিকেন নিভিয়ে জঙ্গলের মধ্যে গল্পে মজে গেলে! আদিনাথই বা কেমন মানুষ, জঙ্গলে পোকামাকড়ের ভয় নেই! সে জঙ্গলে অন্ধকারে বসে থাকতে পারল!"

"আরে, হাওয়ায় হারিকেন নিভে গেলে তার কী দোষ! ওকে তো খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। আন্দাজে জঙ্গলে ঢুকছি, হারিকেন নিভে না গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া যেত বলেও মনে হয় না। ভাগ্যিস নিভে গেল!"

"ভাগ্যিস তোমার মতো মানুষের হাতে হারিকেন ছিল! তা না হলে নেভে, তা না হলে সে সাড়া দেয়! অন্ধকার বলেই টের পেয়েছে তুমি যে-সে মানুষ না। তার তুমি দোসর।"

"দ্যাখো দয়াময়ী, তোমার ক্ষোভের কোনও কারণই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। হারিকেন নিভে যাওয়াটা কি খুবই দোষের!"

আমি আর পারলাম না।

"আজ্ঞে, না বাবা। দোষের না। তবে হাতে আলো থাকতে সাড়া দিলেই বোধ হয় ভাল করত আদিনাথ। আপনাকে নিশ্চয়ই অনুসরণ করছিল।"

"তা করতেই পারে। তার এখন শিরে সংক্রান্তি, তার কি মাথার ঠিক আছে!" এটা যে খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা, বাবাকে বোঝানোও মুশকিল।

মা জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, "কী হয়েছে ওর!"

"কী হয়েছে তা বলতে পারব না! তবে ভাল নেই, কথাবার্তায় বুঝেছি। সে জঙ্গলটায় অনেকদিন থেকেই আছে। অনেকদিন থেকেই একজন নিষ্ঠাবান বামুনের খোঁজে ছিল। তার গৃহে পায়ের ধুলো দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করল।"

"পায়ের ধুলো দিয়ে এলেই পারতে!"

"সেটা আর হল কোথায়। অন্ধকারে যাই কী করে?"

"সে যেতে পারলে, তুমি যেতে পারবে না কেন?"

"অন্ধকারে তাকে দেখা গেলে চেষ্টা করা যেত। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। যেন সেই যে শিরীষ গাছটা—যার মাথা উঠোন থেকে দেখা যায়, তার এ-পিঠে আমি, আর..."

"আর ও-পিঠে কে?"

"মনে হল আদিনাথ।"

"তা হলে তুমি আর আদিনাথ গাছের দু-পিঠে বসে?"

"মনে হয় তো তাই। কত কথা বলল, বাবার নাম যদুনাথ, পিতামহর নাম বৈদ্যনাথ—গাজলের ওদিকে দেশ..."

"থামো। ও আমার উঠোনে কেন মরতে এসেছিল?"

"আমরা কেমন আছি, ঘরবাড়ি কতদূর হল, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে এসেছিল!"

"তার এত দায় কিসের!"

"সে তো জানি না।"

"সোজা বলে দিচ্ছি, সে যেন এভাবে আসে না। বাড়িতে ছেলেপুলে নিয়ে একা থাকি, রাতবিরেতে একটা ষণ্ডামার্কা লোক উঠোনে উঠে এলে সে তোমার যত বড় প্রতিবেশীই হোক ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।"

"যাও একজন প্রতিবেশী জুটল, তাও যে যায় দেখছি দয়াময়ী!" বাবা কী ভেবে শেষে বিছানায় বসে কালীস্তোত্র পাঠ শুরু করে দিলেন। মায়ের সঙ্গে আর একটা কথাও বললেন না।

॥ ৪ ॥

সকালেই অবাক কাণ্ড! মায়া ঠাকুরের থালাবাসন বের করে ঘর লেপতে গিয়ে কী একটা পেয়ে গেল। সে ছুটে এসে মাকে কী দেখাচ্ছে। বাবা পাশে কোথাও জঙ্গল সাফ করছিলেন। আমি গোরুটা বের করছি। উত্তুরে হাওয়া উঠে আসছিল। শীত এবার জাঁকিয়ে পড়বে। ঘাসে, পাতায় শিশির জমে আছে। দাদা চাদর গায়ে বারান্দায় পড়তে বসে গেছে।

ঠিক সেই সময় মা'র ডাকাডাকি শুরু।

"ওগো শুনছ, শিগ্‌গির এসো।"

আমি ছুটে গেছি। মা'র হাতে চকচক করছে একটা মোহর।

মায়া বলল, "ঠাকুরঘরে পেয়েছি।"

বাবার যেন কোনও তাড়া নেই। ঝোপজঙ্গল থেকেই বললেন, "পাওয়া গেছে যখন, তুলে রাখো। দ্বিজপদকে দিয়ে দিলেই হবে। যা ব্যবস্থা করার সে-ই করবে। আমার আবার রক্ষাকালীর পুজো আছে। সকাল-সকাল বের হব। নিবারণ দাসের আড়তে পুজো।"

বাবার ওপর বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। কোনও চেদ্‌ভেদ নেই। মাকে বললাম, "মা, এটা গিনি?"

মা বললেন, "চুপ।"

"দাও দেখি। গিনি কেমন দেখতে হয়, দেখি।"

"না। তোমার বাবা রাগ করবে।"

বাবা কাঁটানটের ঝোপ সাফ করছিলেন। সেখান থেকেই বললেন, "দাও, দেখতে যখন চাইছে দেখুক।"

হাতে নিয়ে গিনিটি দেখছি। দাদাও একলাফে বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে গেল। একটা তামার পয়সার মতো বড়, মহারানী ভিক্টোরিয়ার মুখ মুদ্রাটিতে ছাপ মারা। দাদা দেখল হাতে নিয়ে, মায়াও দেখল। কেবল আমার বাবাই নিস্পৃহ—যেন ঠাকুরেরই ইচ্ছে, সব তাঁরই কৃপা, গিনিটি দ্বিজপদকে দিলে দু-আড়াই মাস সে আমাদের চাল, ডাল, তেল, নুনের ব্যবস্থা করে দেবে। দু-পাঁচ টাকা দরকারে বাবা চেয়েও নিতে পারবেন। কিন্তু কে ঠাকুরঘরে গিনিটি রেখে যায়! এত বড় রহস্য বাবাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না।

এমন গুরুতর বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনাও করা যায় না। মা কি শেষে বাবাকে সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো ক্ষমতাবান ভেবে

ফেললেন ! কাল যে লোকটা রাতে উদয় হল, সে কে ? বাবার আদিনাথ কাজটি করে যায়নি তো ! কে জানে শেষে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণের বিনিময়ে তিনি প্রণামী রেখে গেলেন কি না ! বাবাকে না বলে পারলাম না, "এটা বাবা আদিনাথেরই কাজ। আর কেউ তো আসেনি।"

মা বললেন, "তুমি চুপ করবে !"

"কেন, আদিনাথ হতে পারে না !"

"যেই হোক তিনি খুব দয়ালু, তাঁকে নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি না করলেও চলবে।" মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বাবা আমার দিকে তাকালেন।

বাবার কথায় কেন যে মনে হল, তা হলে বোধিসত্ত্বও হাজির বাড়িতে। রাতে তিনি, আমরা কেমন আছি দেখতে এসেছিলেন স্বচক্ষে। জঙ্গলে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন খবর পেয়েই আদিনাথ হয়ে আমাদের এখানে উদয় হয়েছেন। বাবাকে এখন আর লঘুভাবে দেখা ঠিক হবে না।

ডাকলাম, "বাবা ?"

"বল।"

"বোধিসত্ত্ব আদিনাথ হয়ে আসেনি তো !"

"তা কী করে হবে। ওঁরা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন না। আত্মা মানেন না।"

"তা হলে তো খুবই ঝামেলা।"

"ঝামেলা ভাবলেই ঝামেলা। আমরা জন্মান্তর বিশ্বাস করি, ওরা করে না। আকাশ এবং নির্বাণ এ দুটোই ওরা নিত্য ভাবে, আর সব অনিত্য।"

"তা হলে বলছেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুনর্জন্ম হতে পারে—বোধিসত্ত্বের হতে পারে না।"

"পারে না বলছি না, হওয়া উচিত নয়।"

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বহু পুনর্জন্ম সেরে শেষে এই জঙ্গলে অনায়াসেই ঘরবাড়ি করতে পারে, কিন্তু বোধিসত্ত্ব আদিনাথ হয়ে জঙ্গলে তাঁর প্রতিবেশী হতে পারে না।

আবার ডাকলাম, "বাবা !"

মা বললেন, "আর বাবা-বাবা করতে হবে না। এখন একটু দয়া করে পড়তে বোসো। এখানে এসে তো তোমার পাখা গজিয়ে গেল। বই খোলার নামগন্ধ নেই।"

বেশি আর বাবা-বাবা করা ঠিক হবে না। মা মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়ে আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করছেন। পড়ার কথা বললেই গায়ে জ্বর আসে। সকালে উঠে পড়াশোনা যে করছি না তাও ঠিক। আমার পড়া নিয়ে বাবার কোনও তাড়া নেই। হবে, সবই হবে। সময়ে সব হয়। বড়টা তো পড়ার নাম করে সংসারের কুটো গাছটি নাড়ে না। ছোটটির যদি পড়ার বাই ওঠে, বাবা যায় কোথায় ! তার ফুট ফরমাশ খাটার আর কে আছে !

"যাও, বাজারে যাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভাঙা সাইকেল ঠেঙিয়ে বাজারে।

"যাও হরীতকী নিয়ে এসো।"

"জঙ্গলে ঢুকে হরতুকি নিয়ে আসি।"

"ফুল বেলপাতা লাগে।"

সঙ্গে-সঙ্গে ফুল-বেলপাতা হাজির।

"একশো একটা তুলসীপাতা তুলে রাখবে।"

ঠিক গুনে-গুনে তুলে রাখি।

সেই বাবা আর কোন মুখে বলেন, "গুনে-গুনে অঙ্ক'টি সেরে ফেলো।" বললেও করি না। বাবার মেলা কাজ পড়ে থাকে। কোদালটা দোকানে দেওয়া দরকার। পিটিয়ে সোজা করে দেবে। মা পড়ার কথা বললেন তো বাবার নির্দেশ, "শহরে মানুর

কাছে গিয়ে খবর নাও, অনাথবন্ধু চিঠি দিল কি না ! কতদিন হয়ে গেল !"

আত্মীয়টির 'কেয়ার অফে' আমাদের চিঠিপত্র আসে। শরৎ মাঝির কাছে চিঠিও আসত। খবরাখবর সব আমাকেই নিতে হয়। শরৎ মাঝির কাছে বাড়ি, জমি বাবা বিক্রি করে এসেছেন, যৎকিঞ্চিৎ বাবার হাতে ঠেকিয়ে বলেছেন, 'বাকিটা হুণ্ডি করে পাঠাব। সঙ্গে নিয়ে গেলে দর্শনায় সব কেড়েকুড়ে রেখে দেবে।' সেই হুণ্ডি এখন বাবার কাছে ভূশণ্ডির মাঠ হয়ে গেছে। বাবা এ-দেশে আসার ক'মাস পরেই চিঠি, "কর্তা আমার টাকা ক'টা ফেরত দিবেন, জমি জায়গায় আমার কাজ নাই। নিজেই দেশান্তরী হব, ভাবছি।" টাকা ফেরত দেওয়ার আতঙ্কে বাবা নিজেই এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এখানে এসে উঠলেন বোধ হয় সেই কারণে। যতদিন আত্মগোপন করে থাকা যায় !

মা ফের গজগজ শুরু করে দিয়েছেন, "পড়াশোনার পাট চুকিয়ে শেষে তুই গোরু চরাবি ভাবছিস !"

"ভাবব কী ! গোরু তো চরাচ্ছি।"

"শুনলে, তুমি শুনলে !"

বাবার তখন আপ্তবাক্য, "দয়াময়ী, প্রকৃতিস্থ হোন। জীবমাত্রেই শিব। তাঁকে খাটো করবেন না। যে যেভাবে বাঁচে ! তাড়া দিলে কি সব হয় ? হওয়ার হলে আপনি হয়। দেশ ছেড়ে এসে দেখলেন তো জলে পড়ে যাইনি। দুশ্চিন্তা করে কি কোনও লাভ আছে !"

বাবার এহেন কথায় সাহস পেয়ে গেলাম।

"বাবা গিনিটি দাও, দ্বিজপদকে দিয়ে আসি। তুমি আবার এতটা পথ হেঁটে যাবে ! বেলা কাবার করে তোমাকে ফিরতে হবে।"

"তা হোক। আমিই দিয়ে আসব।"

হল না। বাড়িতে থাকলেই জননী পড়া নিয়ে তিতিবিরক্ত করে মারবেন। কী করি ?

"আদিনাথ কোথায় থাকে দেখে আসব ? তোমাকে যে পায়ের ধুলো দিতে বলল। আমি দিলে হবে না !"

"হবে। তবে খুঁজে কি পাবে ! আদিনাথ আবার আসবে। ঘোর সঙ্কট দেখা দিলেই আসবে। তোমরা কী খাও, জননীর তোমার সংসার চলে কী করে, সবই সে বোধ হয় জানে। আশা করি তোমার মা আর তার ঠ্যাঙ ভেঙে দিতে সাহস পাবেন না।"

তা হলে কি আদিনাথেরই কাজ ! সেই-বা গিনি পাবে কোথায়। সেও তো আমাদের মতো গরিব মানুষ। ষণ্ডামার্কা মানুষ হলে কি গরিব হতে নেই ? কিংবা ওটা তার ছদ্মবেশ।

ডাকলাম, "বাবা ?"

"বলো।"

"আদিনাথ জঙ্গলের কোনদিকটায় থাকে জানো ? কিছু বলেছে !"

"বলল তো, জঙ্গলের ভেতরে কোথায় একটা পরিত্যক্ত ইটের ভাটা আছে। সেখানে সে আর তার পরিবার থাকে।"

"চলে কী করে ?"

"এই তো মুশকিলে ফেললে ! তার কী করে চলে জানব কী করে ? যিনি চালাবার তিনিই চালাচ্ছেন। আদিনাথ নিমিত্ত মাত্র। নিমিত্তমাত্র বোঝো ?"

"তা বুঝি।"

মায়া হঠাৎ কথার মধ্যে নাক গলাল, "বাবা, মা তোমাকে ডাকছে।"

বোধ হয় আদিনাথকে নিয়ে মা চান না আমরা বেশি কথা বলি। বাবাকে সেজন্য ডেকে পাঠিয়েছেন।

হে বাবা, মায়ের এটা কী আবদার !

"হ্যাঁগো, এর থেকে দু'গাছা সোনার চুড়ি গড়িয়ে নিলে হয় না !"

"দু'গাছা করালে আর কিছু থাকবে ! দ্বিজপদর দেনা শোধ হবে কী করে !"

"কেন, তোমার আদিনাথ আছে না ! সে আবার একটা ঠাকুরঘরে ফেলে রেখে যাবে। গিনিটা না ফুরালে সে কি আর একটা গিনি দিতে উৎসাহ পাবে !"

বাবা মাথা চুলকে বললেন, "তা অবশ্য ঠিক। দয়াময়ীর যখন ইচ্ছে হয়েছে, তাই হোক।"

॥ ৫ ॥

এক সকালে দেখি পেটমোটা হেঁড়ে মাথা একজন লোক এসে হাজির। সঙ্গে দ্বিজপদ। গায়ে ফতুয়া, হাঁটুর ওপর ধুতি, মাথায় কদমছাঁট এবং পায়ে কেড্‌স জুতো। মানুষজনের সাড়া এদিকটায় এমনিতেই পাওয়া যায় না। সকাল-বিকেল শুধু কাক ডাকে। শালিখের কিচিরমিচির আওয়াজ, ঘুঘুপাখির ডাকও শোনা যায়। ধর্মরাজ আমার এখন সঙ্গী। যেখানেই যাই সে সঙ্গে থাকে। হঠাৎ দেখলাম ধর্মরাজের গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে দ্বিজপদকে দেখে।

বাবা গন্ধরাজ লেবুর কলম লাগানোর ব্যবস্থা করছেন। একটি বাতাবি লেবুর গাছও লাগিয়ে দিয়েছেন, আমাদের দেশের বাড়িতে যেখানে যে গাছটি ছিল, অনুরূপ সেই-সেই দিকে ফলের গাছ রোপণ করে যাচ্ছেন। দ্বিজপদকে দেখেই বাবার কাছে ছুটে গেলাম। আমাদের বাড়িতে এই সাতসকালে দ্বিজপদ কাকে নিয়ে হাজির, বুঝতে পারছি না ! মা ঘোমটা টেনে একবার বারান্দায় উঁকি দিয়ে গেলেন। বারান্দা থেকে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। ইদানীং বাবার লাগানো স্থলপদ্ম গাছ এবং শিউলিগাছটা বড় হয়ে যাওয়ায় রাস্তার বাকি অংশটা আড়াল হয়ে গেছে। কিন্তু উঠোনেই দু'জন লোককে দেখে মা খুবই ঘাবড়ে গেলেন। মা দ্বিজপদর নাম শুনেছেন। তার দয়াতেই বলতে গেলে আপাতত অন্নকষ্ট ততটা নেই। দ্বিজপদ বাবার পুজোআর্চার দিকটা দেখে। তবে দ্বিজপদকে মা কখনও দেখেননি। নিবারণ দাসের আড়তে রক্ষাকালীর পুজোও দ্বিজপদর কল্যাণে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের খবরটি সে-ই নিবারণ দাসকে দিয়েছিল।

বাবা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"কী সৌভাগ্য ! আপনারা ? ওরে মায়া, দুটো আসন পেতে দে।"

দ্বিজপদই বলল, "দাসমশাই ধরে নিয়ে এলেন। ভুতির জঙ্গলে ঠাকুরকর্তা বাড়িঘর বানিয়ে কেমন আছেন দেখার খুব বাসনা। দুর্জয় সাহস না থাকলে হয় না। সাধক মানুষের পক্ষেই সম্ভব।"

দ্বিজপদ এবং নিবারণ দাস দু'জনেই বাবার পায়ের কাছে সটান গড় হল। পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায়-মুখে ঠেকাল। বাবা আড়চোখে দরজার ভেতরে কেউ আছে কি না দেখছেন। কাকে তিনি খুঁজছেন, বুঝতে কষ্ট হয় না। দ্যাখো, বোঝো, তোমার হেনস্থার শেষ নেই—এরা কারা, জানো !

মায়া ফুলতোলা দুটো আসন বারান্দায় পেতে দিয়েছে। তারপরই বাবার আফসোস, "আপনারা এলেন, বসতে দেওয়ার মতোও কিছু করে উঠতে পারিনি। বস্তা কেটে আমার কন্যা ... এই মায়া এদিকে আয়, ফুলতোলা আসন বানিয়েছে। মন্দ হয়নি কী বলেন !"

বাবা তাঁর বড় পুত্রকে ডেকে বললেন, "এদিকে এসো।"

দাদা বারান্দায় এলে বললেন, "দাসমশাই, এই আমার বড় পুত্র। এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।"

খুবই গৌরবের ব্যাপার। এনট্রান্স পরীক্ষা, সোজা কথা ! আমাদের গাঁয়ে, আপনার তো পাঁচদোনার দিকের খবর জানা আছে। আরে পাঁচদোনার অম্বুজাক্ষ রায়ের মেজো ছেলে, মনে

আছে পড়ার চোটে মাথা খারাপ হয়ে গেল। পরীক্ষায় পাশ করল, খুব ভাল পাশ, কী মেধাবী—তারপর কী যে ধন্ধ লেগে গেল তার ; এত পড়াশোনা করলে মাথার ঘিলু হজম হয়ে যেতেই পারে।"

"তোমার নাম কী বাবা ?"

দাদা নাম বললে নিবারণ দাস খুবই প্রীত হলেন।

"উন্নতি করো বাবা। কর্তাঠাকুরের মুখ উজ্জ্বল করো। ঠাকরুনকে দেখছি না !"

বাবা এবার মাকে ডেকে পাঠালেন। মা দরজায় ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালে নিবারণ দাস ভূমিষ্ঠ হয়ে বললেন, "মা মা, আপনার দয়াতেই সব।"

আমি খুবই আড়ষ্ট হয়ে গেছি। হেতুটি যে কী, বুঝতে পারছি না। বাবা সাধক মানুষ, মায়ের দয়ায় নিবারণ দাসের সব হচ্ছে, এত শ্রদ্ধাভক্তি কী খুব ভাল !

দ্বিজপদ বলল, "দাসমশাই, স্বপ্নে কী দেখেছেন এবারে বলেন ! কর্তা কী বলে শুনুন।"

দাসমশাই বললেন, "সাক্ষাৎ মা জননী শিয়রে এসে দেখা দিলেন। কর্তা, আপনার পূজায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট। তিনি আদেশ করলেন, 'সকালে উঠে কারও মুখ না দেখে সোজা ভুতির জঙ্গলে চলে যাবি। একটা পঞ্জিকার আবদার করেছে। বেশি কিছু তো চায়নি। তাও তুই ঘোরাচ্ছিস !'"

বাবা কেমন আপ্লুত গলায় বললেন, "সাক্ষাৎ মা-জননী—বলেন কী ! সবই নারায়ণের কৃপা।"

"আজ্ঞে কর্তা। মা জননীর মুখ দেখে যে সব ধরে ফেলেছি।"

আমার আর বাক্য সরছে না। বাবার দয়াময়ীর এই কী করুণা ! তিনি স্বপ্নে দেখা দিতে পারেন ! পাগল নাকি লোকটা ! আমার মা বেশি হলে রাস্তা পর্যন্ত যান। পুলিশ ক্যাম্পের কল থেকে দু'ঘড়া জল আমাকেই বয়ে আনতে হয়। দেবীর মুখের সঙ্গে মায়ের মুখ মিলে যাওয়া তো ভাল কথা নয় !

ক'দিন আগে নিবারণ দাসের রক্ষাকালী পূজা করে বাবা বেশি কিছু যে পেয়েছেন তাও না। পুরোহিত বস্ত্র, দেবীবস্ত্র কিছুই দেননি। সব কাজ গামছা দিয়ে সেরেছেন। দক্ষিণাও নাম মাত্র। ভোজ্যও সামান্য। চাল আর কাঁচকলা, হলুদ। লোকটি খুবই যে কৃপণ তাও টের পেয়েছি। তাঁর কাছেই বাবা একটি পঞ্জিকার আবদার করেছিলেন, ব্রাহ্মণের বাড়িতে নতুন পঞ্জিকা না হলে চলেও না। তিথি-নক্ষত্রের খবর, দিনক্ষণের শুভ-অশুভ, মনসাতলায় গেলে বাবার কাছে আজকাল লোকের ভিড় হয়। পঞ্জিকা না থাকায় কিছু বলতেও পারেন না। দেশের লোক নিবারণ দাস এখানে এসে আড়ত করেছেন, দ্বিজপদই বাবাকে খবরটা দিয়েছিল। দেশের লোক না বলে মুল্লুকের মানুষ বলাই ভাল। বাবার নাম শুনেই চিনতে পেরেছেন। অগাধ অর্থের মালিক এবং বিষয়ী লোক। সম্পত্তি হস্তান্তর করে এ-দেশে এসেছেন। এক কপর্দকও তাঁর খোয়া যায়নি। দেশের মানুষের কাছে বাবা আবদার করতেই পারেন। দোষের না।

বাবা জলচৌকিতে বসে। মা চা করছেন অভ্যাগতদের জন্য। মায়া মার সঙ্গে রান্নার চালায় ব্যস্ত। দাদা উচ্চৈঃস্বরে পড়ছে। দাদা কত কঠিন-কঠিন বিষয় পড়ে, এদের বোধ হয় জানানো দরকার। গরিব ব্রাহ্মণের পুত্র হতে পারে, তাই বলে বিদ্যাচর্চার কোনও খামতি নেই পরিবারে।

আমি কিছুটা নির্বোধের মতোই শুধু সব দেখছি, শুনছি। আমার সম্পর্কে বাবারও খুব একটা আগ্রহ নেই।

"এক গ্লাস জল খাব কর্তা।"

"খালি পেটে জল খাবেন !"

আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, "যাও, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন !"

এক গ্লাস জল এল। রেকাবিতে একটা বাতাসা।

তারপরই দ্বিজপদ আসল কথায় বোধ হয় এল।

"দাদামশাই আর যেন কী আর্জি আছে !"

"ও তেমন কিছু না। একটি নতুন পঞ্জিকা।"

দাসমশাই নতুন পঞ্জিকাটি অম্লান বদলে বাবার পায়ের কাছে রেখে ফের ভূমিষ্ঠ হলেন।

"কর্তার কাছে সবই নির্ভয়ে বলতে পারেন।"

বাবা সত্যি সদাশয় হয়ে গেছেন। একটা আস্ত নতুন পঞ্জিকা, না, ভাবা যায় না। পঞ্জিকার পাতা ওলটাচ্ছেন। আগাপাশতলা খুঁটিয়ে দেখার অবশ্য এখন সময় নেই। তবে আগামী কিছুদিন যে তিনি এই পুস্তকখানি হাতছাড়া করবেন না, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

দ্বিজপদই বলল, "গিনি কি অবশিষ্ট কিছু আর আছে ? দাসমশাই সবক'টির উপযুক্ত মূল্য ধরে দেবেন।"

এই রে ... এত বড় গোপন খবর ফাঁস হয়ে গেল ! দ্বিজপদ ছাড়া আর কেউ বাবার কাছে গিনি আছে জানে না। ধার-দেনায় ডুবে থাকলে যা হয়, বাবা দ্বিজপদকে গিনিটি দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবারের গিনিটি বাবার কাছে, না, মার কাছে তাও জানি না। বাবার নানা বাতিক আছে তাও জানি। গুপ্তধন সবার সয় না। এজন্যও বাবা বোধ হয় গিনিটি দ্বিজপদর হাতে তুলে দিয়ে ভেবেছিলেন—যাক সব পরে-পরে। ধার-দেনা শোধ—অথচ গিনিটিও ঘরে থাকল না। ঘরে রেখে দিলেই অমঙ্গল।

আর তখনই ধুতির গোঁজ থেকে একটা তফিল বের করলেন দাসমশাই। তফিল থেকে পরম যত্নে কী যেন বের করছেন।

দাসমশাই একটি ছোট কাসকেট পায়ের কাছে রেখে বললেন, "মা ঠাকরুনের মনোবাঞ্ছা।"

"মনোবাঞ্ছাটা কী আবার !"

ও বাবা, বাবা খুলে দেখেন দু'গাছা সোনার চুড়ি।

তা হলে বাবা দ্বিজপদকে দ্বিতীয় গিনিটিও গছিয়ে এসেছেন। বাড়িতে রাখতে সাহস পাননি। কে জানে গিনির গন্ধ পেয়েই আদিনাথ রাতে উদয় হয়েছিল কি না। বাবা তো কিছু ঝেড়ে কাসছেন না ! আদিনাথ কে, তাও জানা নেই। শুধু প্রতিবেশী হলেই হয় না। সে কী করে, জঙ্গলে সে থাকে কেন, তার সংসার নির্বাহ হয় কী করে—কিছুই জানা নেই। কিংবা আদিনাথ দাসমশাইয়ের চর নয় তো ?

দ্বিজপদ কাজটা ভাল করল না। দ্বিজপদ কথা দিয়েছিল, না কর্তাঠাকুর আর কেউ জানবে না। আপনি জঙ্গলে থাকেন, যদি জানাজানি হয়ে যায় চোর-ডাকাত হামলা করতেই পারে।

আর আদিনাথেরও খবর নেই। সেই যে বাবার সঙ্গে জঙ্গলে বসে পরামর্শ করে চলে গেল, আর এলই না। আমরা রোজ অপেক্ষা করি—মা তো একদিন বলেই ফেললেন, তোমরা একবার আদিনাথের খবর নিলে না ! শত হলেও প্রতিবেশী। রাগের মাথায় কী বলেছি, তাই ধরে বসে থাকতে আছে !

মা মনে করতেই পারেন, এটা আদিনাথের কাজ। গরিব ব্রাহ্মণ ঘরবাড়ি তৈরি করছেন, অভাব-অনটন আছে, সে প্রতিবেশী হয়ে স্থির থাকে কী করে ! বোধিসত্ত্ব আদিনাথ না হয়ে জন্মালে এত দয়ামায়াও থাকত না। সেই গিনিটি ঠাকুরঘরে রেখে যায় গুরুর প্রণামী বাবদ। আবার এলে আবার প্রণামী। মা কেমন আশাকুহকিনী হয়ে আছেন। কতক্ষণে সকাল হবে। রাতে মা বোধ হয় ঘুমোনও না। আমিও কখন সকাল হবে এই ভেবে বসে থাকি। সকাল হলে সবাই ঠাকুরঘরের দরজা খুলে তন্নতন্ন করে খুঁজি। উঠোনে, স্থলপদ্ম গাছটার নীচে খুঁজি—রাস্তায় কিংবা জঙ্গলে ঢুকলে একমাত্র নজর, যদি সহসা কিছু চকচক করে ওঠে।

সারাদিন খুঁজে গিনিটি না পেলে মার অসহিষ্ণুতা প্রকট হয়। বাবার প্রতি মা এত অসহিষ্ণু যে, খাওয়ার পাতে না বলে পারেন না, "দিব্যি ঠ্যাঙ মেলে ঘুমাচ্ছ। চলবে কী করে! একবার আদিনাথের খোঁজ নিলে না পর্যন্ত। নিষ্কর্মা মানুষ তুমি বোঝো।"

"কী মুশকিল! কোথায় খুঁজব! ও তো বলে গেছে আবার আসবে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে কোথায় সেই পরিত্যক্ত ইটের ভাটা আছে জানব কী করে? মানুষের সাধ্য আছে ঢোকে! ঘোর বর্ষায় লতায়, পাতায়, আগাছায় কী হয়ে আছে জঙ্গলটা। শীতকাল আসছে। লতাপাতা, আগাছা হেজেমজে গেলে পিতাপুত্র না হয় একবার খুঁজতে বের হব।"

পিতাপুত্র মানে আমি আর বাবা।

শীত এলেই জঙ্গল ফাঁকা হয়ে যায় জানি। পোকামাকড়ের উপদ্রবও থাকে না। বাবা ঠিকই বলেছেন, একটা যে রাস্তা ওদিকের কারবালার মাঠে গিয়ে পড়েছে তাও জানি। তবে সে রাস্তায় হেঁটেই যাওয়া যায়। সাইকেল চালানো যায় না। ওদিকটায় বিশাল কবরভুমি আছে, মিনা-করা সব ভাঙাচোরা গম্বুজ সাদা পাথরের সমাধির ওপর বেদি-ফলকে কারও-কারও নামেরও উল্লেখ আছে। বাবার দুর্জয় সাহসী পুত্রের পক্ষেই সেখানে একা যাওয়া সম্ভব।

গিনির খবর জানাজানি হয়ে যাওয়ায় বাবা খুবই তটস্থ। একেবারে নির্বাক। দু'গাছা সোনার চুড়ি হাতে নিয়ে বসে আছেন। মা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আতঙ্ক আমাদের, ফাঁস হয়ে গেলে জঙ্গলে থাকাই দায়! অবশিষ্ট গিনির খোঁজে দাসমশাই এসেছেন। দ্বিজপদও বিশ্বাস করে, কর্তা গরিব হতে পারেন, তবে গুরুবংশ। গুরুকে তুষ্ট করার জন্য মানুষ দিতে পারে না এমন কিছু নেই। মণিরত্ন, জমিজমা, তালুক, প্রাসাদ সবই দিতে পারে। বাবা বংশের শেষ বাতি। বাতিটি জ্বালিয়ে রাখার জন্য পূর্বপুরুষরা যে কিছুটা গুপ্তসম্পদ রেখে যাননি তাই-বা দাসমশাই বিশ্বাস না করে থাকেন কী করে!

বাবা পড়ে গেলেন মহাফাঁপরে।

দ্বিজপদ, দাসমশাই উভয়ে পীড়াপীড়ি করছেন তখনও, "কেউ জানবে না। উপযুক্ত দামেরও অভাব হবে না। আপনি দিন। অমূল্য সব মুদ্রা।"

দ্বিজপদ বলল, "আমি ভরসা করতে পারলাম না কর্তা। ঘরে রাখতেও সাহস পেলাম না। আগের গিনিটি দাসমশাইকে দিয়ে টাকা নিয়েছি। এবারের গিনিটি দেওয়ার সময় বললাম, কর্তামার খুব ইচ্ছে, দু'গাছা সোনার চুড়ি পরেন। ওটা করে দিন, বাকি টাকাটা দিয়ে কর্তার যে ক'দিন চলে!"

বাবার মুখটা খুবই করুণ দেখাচ্ছে। একটি নাতিদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাসও উঠে এল। দাদা ওদিকে থম মেরে বসে আছে। মা, মায়া যে কোথায়, বলা যাবে না!

বাবা অতিশয় নিরুপায় গলায় বললেন, "দাসমশাই, আমি গরিব বামুন। গিনি পাব কোথায়! আমার কাছে তো আর গিনি নেই।"

দাসমশাই নাছোড়বান্দা। বাবার কথায় কর্ণপাত করলেন না।

বাবা কী বলবেন! একবার দ্বিজপদর দিকে তাকালেন। দ্বিজপদ যে গিনিটি হস্তান্তর করে বড়ই বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেছে, নিরুপায় ব্রাহ্মণের কাছে দ্বিজপদ ছাড়া কেউ কাছের লোকও ছিল না যে, গিনিটি নিয়ে অন্য কোথাও যাবেন।

মায়া কাপে করে চা এবং একবাটি মুড়ি সবার সামনে রেখে গেল। রেকাবি করে কিছু নাড়ু, মোয়া।

দ্বিজপদই বলল, "আপনার কোনও অভাব থাকবে না। ঘরবাড়ি উঠবে। আপনি দিলে বাড়িঘরের চেহারাই দাসমশাই পালটে দেবেন। গৃহদেবতার ঘরটি তালপাতায় ছেয়েছেন। বর্ষা বাদলায় ঝড়ে সব উড়ে যেতে কতক্ষণ।"

বাবা এতে যে সবিশেষ বিরক্ত, বোঝা গেল। তাঁর ঘরবাড়ি তিনি নিজে করেছেন। বাঁশ পুঁতে দু'-বান টিন এনে বাছারিঘরটি করার যে অনেক হ্যাপা, দ্বিজপদ তার বিন্দুমাত্র মর্যাদা দিচ্ছে না। ঘরের অন্নপূর্ণা শুনতে পেলে তিনি যে যথার্থই নিষ্কর্মা তাও প্রমাণ হয়ে যাবে।

বাবা বললেন, "গরিবের এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার হয় না।"

বাবা হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কাছে গেলে দু'গাছা চুড়ি আমার হাতে দিলেন।

"তোমার মার মনোবাঞ্ছা। তাঁকে নিয়ে দাও। বলবে, দাসমশাই খুবই দয়ালু মানুষ, তিনি আজ নতুন পঞ্জিকা দিয়েছেন, তোমার মায়ের দু'গাছা চুড়িও তিনি গড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের লোকজন চলে এলে পূজা-পার্বণও শুরু হয়ে যাবে। গরিব বামুনের অভাব থাকবে না। তোমার মায়ের এই যে নাই-নাই ভাবটা, তার একটা সুরাহা হবে।"

মা সবই জানেন। মা তো সব দেখেও গেছেন। তবু আমার মনে হল, দাসমশাইকে খুশি করার জন্যই কথাগুলি বলা।

দ্বিজপদ বলল, "দেশের মানুষেরা কি এখানে এসে উঠতে রাজি হবে!"

"কেন হবে না দ্বিজপদ! তারা যাবে কোথায়! দেশে কেউ থাকতে পারবে না। রিফিউজিরা বানের জলের মতো ভেসে আসছে। স্টেশনে, ক্যাম্পে পশুর জীবন যাপন করছে। আমার গাঁয়ের লোকদের জন্য জায়গাটা নির্বাচন করেছি। অনাথের চিঠির অপেক্ষায়। রাজবাড়িতে আর্জি জানিয়েছি—পানীয় জলের যদি কোনও সুবন্দোবস্ত করে দেয়। এমন জলের দামে জমি ভুভারতে আর কোথায় পাওয়া যায় জানি না। দু'দিক থেকে দুটো রাস্তা বের করে দিতে পারলে জায়গাটা আর দুর্গম কে বলবে!"

দ্বিজপদ বলল, "আপনি দেশের চিন্তা ছাড়ুন। ঈশ্বর চিন্তা করুন। দেশের চিন্তা দাসমশাইয়ের ওপর ছেড়ে দিন। পানীয় জলের খুবই অভাব। দাসমশাই, কর্তাঠাকুরের বাড়িতে একটা টিউকল করে দিলে হয় না। রাজবাড়ি থেকে কবে করে দেবে সেই আশায় বসে না থাকাই ভাল।"

দ্বিজপদকে কিছুটা ভর্ৎসনাই করলেন দাসমশাই, "তুমি তো আচ্ছা মানুষ দ্বিজপদ। কর্তার সুখ-সুবিধার দিকে তোমার দেখছি বিন্দুমাত্র নজর নেই। বামুনের বাড়িতে জলের ব্যবস্থা নেই! খবরটা একবার দাওনি! তুমি কী হে!"

দ্বিজপদ বলল, 'টিউকলটা রান্নাঘরের পাশে দিলেই হবে।"

বাবা কেন যে বললেন, "না দ্বিজপদ, ভেতরে হবে না। রাস্তায় বসানো দরকার। আমার তো সব ভাঁড়ে মা ভবানী। টিউকল বসাবার ক্ষমতা আমার নেই। দাসমশাই ধনবান মানুষ, তিনি দেশের লোক, যাঁরা আসছেন, তাঁদের জন্য রাস্তায় টিউকলটি করলে ভাল হয়। পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত আছে জানলে এই জঙ্গলে সবাই ঘরবাড়ি করার উৎসাহ পাবে। এতে দাসমশাইয়েরও পুণ্য সঞ্চয় হবে।"

আমার ভয় হচ্ছিল, বাবা না শেষপর্যন্ত চাপে পড়ে বলে দেন, ঠাকুর কৃপা করেছেন। গরিবের অন্নকষ্ট তিনি সইতে পারছিলেন না। ঠাকুরঘরেই গিনি দুটো পাওয়া গেছে। অভাব অনটনে দয়াময়ীর মাথাখারাপ হলেই চোপা শুরু হয়ে যায়। বাবার তখন সসেমিরা অবস্থা, ঘরে চোপার চাপে টেকা দায়, বাইরে দেনার দায়ে বাবা অস্থির, তখনই কী যে হয়, কেউ একটা গিনি রেখে যায়। অথবা বাবা প্রকৃতই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি তিথি-নক্ষত্র যোগে মন্ত্র পড়ে গিনিটি আকাশ থেকে নামিয়ে আনেন।

তবে আমি জানি, এসব গুহ্য কথা প্রকাশ করা অনুচিত কাজ। এতে মন্ত্রশক্তি জোর হারিয়ে ফেলে। বাবার সত্যিকথা বলাও খুব বিপজ্জনক। এখন যে কী উপায়, বুঝতে পারছি না।

দাসমশাই সহজে ছাড়ার পাত্র নন।

"ঠিক আছে কর্তামা'র সঙ্গে কথা বলে দেখুন। তিনি দেবীতুল্যা—তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে জানাবেন। তাঁর কোনও অভাব থাকবে না। দরকারে আমি না হয় কোঠাবাড়ি করে দেব। দুটো রাস্তা, তাও বের করে দেব। পুকুর, মাঠ, বাগান সবই হবে। অবিকল সাহাপুর গ্রামটাই না হয় আমি এখানে তুলে আনব। আমার একটাই দাবি, অমূল্য মুদ্রাগুলি পেলে আমিই পাব।

॥৬॥

শীতের হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরছে। পাতা উড়ছে। বনজঙ্গল ক্রমে ন্যাড়া হয়ে যেতে থাকল। জঙ্গলটা আর আমার কাছে দুর্গম রইল না। বাবার প্রতি মায়ের তাড়না দিন-দিন আরও বাড়ছে। আদিনাথের কোনও খবর নেই। সেই যে রাতে চালতাতলা দিয়ে অন্ধকারে নিষ্ক্রান্ত হল, তার আর পাত্তা নেই। মায়ের দুশ্চিন্তা—আদিনাথ মরেছে না বেঁচে আছে, তারও তো খোঁজ নেওয়া উচিত। মাস পার হয়ে গেল, ঠাকুরঘরে গিনি কেন, তামার একটা ফুটো পয়সাও কেউ রেখে যায় না!

রাস্তায় একটা টিউকল দাসমশাই লোকজন পাঠিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। আমাকে আর কলসি মাথায় জল নিয়ে আসতে হয় না। মায়া নিজেই ঘড়া-ঘড়া জল তুলে রাখে। নতুন টিউকল পেয়ে মায়া যখন-তখন বালতি-বালতি জল তুলে আনে।

অনাথকাকাও হাজির এক সকালে।

বাবা অনাথকাকাকে নিয়ে দাসমশাইয়ের কাছে চলে গেলেন। বগলে ছাতাটি নিয়ে ফিরতে-ফিরতে বেলাও হয়ে যায়। একটা নীলরঙের নকশা নিয়ে একদিন দ্বিজপদ আর দাসমশাই হাজির। আমাদের ফেলে আসা গ্রামটার নকশা বুঝতে অসুবিধে হল না। দাসমশাইয়ের আড়তে কী কথাবার্তা হয় জানি না। তবে জঙ্গল কেটে দুটো রাস্তা বের করার কাজ চলছে, আমি আর ধর্মরাজ জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে টের পাই।

অনাথকাকা কিছুদিন সপরিবারে আমাদের বাড়িতে ছিলেন। রাজবাড়ি গেছেন বাবাকে নিয়ে। এবং জমিজমা কিনে ঘরবাড়ির যখন বন্দোবস্ত করা হচ্ছে তখনই একদিন মা আর সহ্য করতে পারলেন না, "আরে তুমি মানুষ, না অপদেবতা!"

ভাগ্যিস অনাথকাকা এবং তাঁর পরিবার অস্থায়ী ঘর তুলে পাশের জঙ্গলে উঠে গেছেন, তিনি থাকলে বাবার যে বিড়ম্বনার শেষ ছিল না!

বাবা নির্বিকার গলায় বললেন, "যা ভাবো।"

মায়ের কাতর অভিযোগ—"নিজের ভালমন্দটুকুও বুঝবে না? পরের গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে বেড়ালেই চলবে! গাঁয়ের মানুষজন চলে আসছে, কোথায় উঠবে, কোথায় থাকবে, এত দৌড়ঝাঁপ, কথা বললেই. এক কথা, এখন নয় দয়াময়ী। পরে। গিনির খবর ঠিক চাউর হয়ে গেছে। গিনির লোভেই সব পঙ্গপালের মতো নেমে আসছে, বোঝো না!"

বাবার নির্বিকার কথা, "গিনি যদি হরির লুটের বাতাসা হয়, পাবে। ভাগ্যে থাকলে পাবে। তোমরাও তো বসে নেই। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করছ জঙ্গলে।"

আমি নিতান্ত হতাশ, বাবা বলছেন কী! লুটের বাতাসা হলে পাব। ভাগ্যে থাকলে পাব। এখন তো ধর্মরাজকে নিয়ে লুটের বাতাসাই খুঁজছি। কোথাও কিছু পড়ে নেই। সকাল, দুপুর, বিকেল কুকুরটাকে নিয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকি। বাড়ি ফিরলেই, মা ছুটে আসেন, মায়া ছুটে আসে। কেবল দাদা আসে না। সামনে পরীক্ষা। তার আসার উপায় নেই। মা, মায়া ঠাকুরঘরে, বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যদি আবার একটা মেলে!

পরিত্যক্ত ইটের ভাটাও খুঁজে পেয়েছি। বনজঙ্গল সেদিকটায় তত ঘন নয়। শুধু বড়-বড় সব জলাশয়। আর সব বাতিল ভাঙা ইটের ডাঁই। মানুষজনের কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। আদিনাথকেও খুঁজছি। সে আমাদের প্রতিবেশী, ডাকলেই সাড়া পাব।

কেউ সাড়া দেয়নি।

তারপর যা হয়, চারপাশে বিশাল সব বৃক্ষ আর তার নীচে একজন গরিব বামুনের পুত্র যদি গুপ্তধনের আশায় ঘুরে বেড়ায় তার ভয় হওয়ারই কথা। গা-ছমছম করতে থাকে। এদিকটায় মাটির সব বড়-বড় ঢিবি। ঢিবি পার হয়ে একদিন ছুটতে গিয়ে চক্ষু আমার ছানাবড়া!

বিশাল একটা গোখরো ফণা তুলে তাড়া করছে।

ধর্মরাজ এবং আমি দু'জনেই প্রাণের দায়ে ছুটছি।

গোখরোটা কোমর পর্যন্ত ফণা তুলে ধেয়ে আসছে।

কী করি! গলা শুকিয়ে গেছে। হাত-পা অবশ।

হয়তো ভিরমি খেয়ে পড়েই যেতাম। আর আশ্চর্য, জানি না এটা কোন ঘোর থেকে দেখলাম, এক রূপবতী কন্যা গোখরোর লেজ ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে কোথায় জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তবে কি তিনিই বনের সেই দেবী! বাবা তো আমার মিছে কথা বলেন না!

বাড়ি ফিরে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছি।

মা শুধু বলেছিলেন, "তোর কী হয়েছে!"

আমি কেমন বোবা বনে গেলাম।

বাবা সন্ধ্যায় ফিরে সব শুনে বললেন, "ও কিছু না।" দাঁতের ডগায় একটু নুন তুলে খাইয়ে দাও। নিরাময় হয়ে যাবে। আতঙ্ক থাকবে না।" বাবা শেষে বলেছিলেন, "রোদে-রোদে না ঘুরে দেশ থেকে মানুষজন সব চলে আসছে, ঘরবাড়ি বানাচ্ছে, তাদের কাজে সাহায্য করলেও উপকার হয়। যেখানে-সেখানে গিনি পড়ে থাকবে, ভাবো কী করে!"

মা বাবার ওপর এমনিতেই অতিষ্ঠ হয়ে আছেন। 'নিজের নাই খেতে শঙ্করাকে ডাকে।' তিনি পরোপকার করে বেড়াচ্ছেন! যাও হাতের পাঁচ গিনি সম্বল ছিল ঠাকুরঘরে, তাও যে যায়! মা এতই হতাশ যে, তাঁকেও দোষ দেওয়া যায় না। এখন বলে কিনা যেখানে-সেখানে গিনি পড়ে থাকবে, ভাবো কী করে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বোধিসত্ত্ব—কত না বড়-বড় কথা! গেল কোথায় সব? মা আমার এমন ভাবতেই পারেন।

দাসমশাই এলে মায়ের আরও মাথাখারাপ হয়ে যায়। বাড়ি এসে দাসমশাই সমানে তাগাদা দিয়ে যান, "গিনি, গিনি, গিনি।" গিনি চাই তাঁর। গিনি নিয়ে সবার মাথাখারাপ, একমাত্র বাবাই নির্বিকার।

"কর্তামা রাজি হল!"

দাসমশাইয়ের ধারণা, কর্তামার জন্যই বাবা বাকি গিনিগুলি তাঁকে দিতে পারছেন না। কর্তামাকে খুশি করারও কম চেষ্টা হচ্ছে না। দু'খানা তাঁতের নতুন শাড়ি দিয়ে বলেছেন, "আপনি মা, আমাদের দশভুজা, আপনার ইচ্ছে হলেই সব হয়।"

ক্ষোভে, জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়ি। কোথায় পাব গিনি! খুঁজে-খুঁজে হয়রান, গিনির খোঁজে প্রাণসংশয়, দাসমশাই কী বোঝেন! গিনির লোভে দাসমশাই জঙ্গলটাকে বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছেন। সরকার থেকেও টাকা-পয়সা আসছে। সবই দাসমশাইয়ের চেষ্টায়। আরও দুটো টিউকল হয়ে গেছে। বাবা একদিন একটি তেঁতুলের চারা নিয়ে এসে পুকুরের পাড়ে পুঁতে দিলেন। অনাথকাকার বাড়ি ঢুকতে বড় রাস্তা পড়ে। সেখানে একটি শিমুলগাছও লাগানো হল। আমাদের গাঁয়ে যেতেই বড় একটা শিমুলগাছ ছিল, আমাদের পুকুরঘাটের পাড়ে বড় একটা তেঁতুলগাছ ছিল। বাবার আহ্লাদের শেষ নেই।

বাবার এখন খবরের শেষ নেই। বাড়ি ফিরলেই একটা না

একটা সুখবর। "মাঝিবাড়ির হেমন্ত এসে করুণাময়ের বাড়িতে উঠেছে। জায়গাটা খুব পছন্দ তার। তোমার কথা বলল, পিলু, বিলু কত বড় হয়েছে খবর নিল। বিকালে সবাই আসবে ঠাকুরের চরণামৃত নিতে।"

বাবা কোথা থেকে একদিন একটি বেতগাছের শেকড় নিয়ে এলেন। এদেশে গাছটি দেখা যায় না। লতানে কাঁটা গাছ—তার ঝোপ এক-একটি গভীর স্নিগ্ধ সবুজ সমারোহ। শীতে বেথুন ফল থোকা-থোকা। এমন একটি দুর্লভ লতানে গাছ কোথায় লাগানো যায়, তাই নিয়ে বাবা সবার সঙ্গে পরামর্শ শুরু করে দিলেন। শেষে ঠিক হল, আমাদের বাড়ির উত্তরের দিকটায় লাগানোই শ্রেয়।

আমাদের বাড়িটায় এখন লোকজনের ভিড় লেগেই থাকে। আমার ভালই লাগে। যারাই আসুক, জমিজমা কিনুক, বাড়িঘর করুক, তাদের কারও আমাদের বাড়ি না এসে উপায় থাকে না। গৃহদেবতা আমাদের খুবই জাগ্রত। বাবা গলায় গামছা বেঁধে নারায়ণ শিলা, কষ্টিপাথরের রাধাগোবিন্দের মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। সারা রাস্তায় জলগ্রহণ করেননি। প্রায় তিনদিনের রাস্তা, বাবা নির্বিকল্প হয়ে স্টিমারে, স্টেশনে, রেলগাড়িতে বলতে গেলে সমাধিস্থই ছিলেন। বামুন পরিবারটি ঠাকুর-দেবতা নিয়ে দেশান্তরী হওয়ায় গাঁয়ের লোকজনও ভাল ছিল না। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুতে ঠাকুরদেবতা না থাকলে মানুষের কোনও ভরসাও থাকে না! তারা না এসে পারে!

বাবা এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে খুব আহ্লাদের গলায় ডাকলেন, "দয়াময়ী..." বাবা জলচৌকিতে বসে নামাবলীটা আমার হাতে দিলেন। গরম পড়ে গেছে। রোদের তেজে গাছপালা সব পুড়ছে। তবে সকালে-সন্ধ্যায় শীতের কামড় কমেনি। বাবার গরম লাগায় নামাবলীটা আমার হাতে দিলেন, না মার সাড়া না পাওয়ায় ঘেমে উঠছেন, বোঝা গেল না! দয়াময়ী রুষ্ট হলেই যে বাবা আমার কাতর হয়ে পড়েন!

আমার দিকে তাকিয়ে খুব সতর্ক গলায় বললেন, "তোমার মা কোথায়?"

"বাড়িতেই ছিল। দেখছি।"

দয়াময়ীর কণ্ঠ পাওয়া গেল।

"তোমার বাবার কি দেশ উদ্ধার হয়েছে? এতক্ষণে ফিরলেন!"

বাবা ঠিক সাহস পেয়ে গেলেন। না, বাড়িতেই আছে। আজকাল দয়াময়ী রুষ্ট হলে এ-বাড়ি সে-বাড়ি চলে যান। আমরা সাধ্যসাধনা করে নিয়ে আসি। বাড়িতে থাকায় বাবার আহ্লাদ বোধ হয় বেড়ে গেল।

"যাক, গ্রামটাকে শেষপর্যন্ত খাড়া করা গেছে। প্রতাপ চন্দ চিঠি দিয়েছে, সেও চলে আসবে। দেশে কেউ আর পড়ে থাকল না।"

এখন ঘরে-ঘরে হারিকেন। দাদার আলাদা হারিকেন। বারান্দায় হারিকেন জ্বলে। একটা টর্চবাতিও হয়ে গেছে। মায়া জামাপ্যান্ট ছেড়ে ঘরে-ঘরে ধূপদীপ দিচ্ছে। ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে।

তখনই ফের দয়াময়ীর গলা পাওয়া গেল।

"তোমার বাবাকে বলো, হাত-মুখ ধুয়ে যেন একটু কিছু মুখে দেন। কোন সকালে বের হয়েছেন, ফিরলেন রাত করে। দাসমশাই এসেছিলেন, তাঁকে সাফ বলে দিয়েছি, বামুন ঠাকুরটির ওপর মোটেও ভরসা করবেন না। গিনি আমাদের নেই। দুটো গিনি ঠাকুরঘরে কে ফেলে রেখে গেছিল আমরা জানি না। মহা ভুতুড়ে কাণ্ড!"

"ইস গেল, সব গেল! দাসমশাই কি আর উপুড়হস্ত করবেন! গিনির লোভে এতদিন দয়ার সাগর ছিলেন, এখন এর পরিণাম কতদূর গড়াবে কে জানে!"

বাবা কত সহজে বলতে পারলেন, "বলে ভালই করেছ। দাসমশাই গিনির কুহকে পড়ে গেছেন। কুহকে ফেলে দিলে পাপ হয়। এতে পাপ খণ্ডন হয়ে গেল।"

ফের দয়াময়ীর গলা পাওয়া গেল।

"পাপ খণ্ডন হয়নি। দাসমশাইয়ের কুহক ঠিকই আছে। মহা ভুতুড়ে কাণ্ড বিশ্বাসই করেননি। ভূতটুত মিছে কথা। ঠাকুরঘরে ভূত ঢোকে সাহস কী!"

যাকগে, এটা মন্দের ভাল। বাকি গিনিগুলি মা হাতছাড়া করতে চাইছেন না, এই বিশ্বাস নিয়েই দাসমশাই চলে গেছেন। ভূতটুতের গপ্পো ফেঁদে দাসমশাইকে বোকা বানানো কঠিন, বাবাও বোধ হয় এটা টের পেলেন। কী করা যায়, এমন বোধ হয় চিন্তা করছিলেন। কে রেখে গেল গিনি দুটো, এটা যে প্রকৃতই তাজ্জব কাণ্ড, বাবার বোধ হয় সেই বোধোদয় হয়েছে। দাসমশাইকে নিরস্ত করা দরকার। গিনির লোভে উদারহস্ত কতটা আর থাকবে, তারপর গরিব ব্রাহ্মণকে ঋণের দায়ে যদি ভিটেছাড়া করে দেন! পথে বসান! বাবা চুপচাপ বসে থাকায় আমার ভয় ধরে গেল।

"আচ্ছা বাবা, ভূত আমাদের দয়া দেখাতে পারে না!"

"নিশ্চয়ই পারে।"

"তবে দাসমশাই ভূতের কথা বিশ্বাস করল না কেন?"

"দাসমশাই বাস্তববাদী মানুষ। বিষয়ী মানুষ। সরকার এগিয়ে না এলে দাসমশাই কতটা এগোতেন। বলা কঠিন। ভূত বিশ্বাস না করে মানুষের উপায় আছে? ভূত আর ভগবান হল গে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। যে যেমনটা দ্যাখে! বোঝে।"

আর তখনই দেখি অন্ধকার উঠোনে সেই যণ্ডামার্কা মানুষটি হাজির। বোধ হয় মায়াই আগে দেখতে পেয়েছে, সে ছুটে এসে বাবার কানে-কানে বলল, "ওই দ্যাখো আদিনাথ, ঠাকুরঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে।"

মাও ছুটে এসেছেন।

বাবা ভাল করে দেখার জন্য হারিকেন তুলে অন্ধকার উঠোনে নেমে গেলেন। বাবা কাঁধের নামাবলীটা আমি ফেলে দিলাম। খালি গায়ে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

আদিনাথ অন্ধকারে চালতা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা বোধ হয় অনুসরণ করছেন। ধর্মরাজ লাফিয়ে ছুটে গেল। মা চেঁচিয়ে ডাকছেন, "আদিনাথ শোনো, চলে যাচ্ছ কেন? ভয় নেই। আমরা ব্রাহ্মণ বলে ভয় করার কিছু নেই। তোমার ঠ্যাঙও ভেঙে দেব না। এই পিলু, দ্যাখো তোমার বাবা একা চলে যাচ্ছে। শিগ্গির যাও। আদিনাথ বাবাকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। আদিনাথকে দেখলেই বাবা তোমার ঘোরে পড়ে যায়।"

টর্চটা নিয়ে ছুটলাম। এখন চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করতে সহজেই পারি। কিন্তু চেঁচামেচি করা উচিত হবে না, কে কোথা থেকে ছুটে এসে আদিনাথকে পাকড়াও করে ফেলবে, পাকড়াও করে ফেললে আদিনাথের গিনি রহস্য তারা জেনে ফেলবে, কাজেই অনুসরণ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় রইল না।

জঙ্গলে কিছুটা ঢুকতেই মনে হল আদিনাথ এল, চলে গেল, গিনিটি ঠিক যথাস্থানে বোধ হয় ফেলে রেখে গেছে। আমি নিজেই কেমন গিনির কুহকে পড়ে গেলাম। আদিনাথের দয়া যদি এবারেও হয়! ঠাকুরঘরের কপাটের ফাঁক দিয়ে যদি গিনি ছুড়ে দিয়ে যায়, দিতেই পারে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব-অনটন দেখা দিলেই সে হাজির হয়। ছুটে এসে দরজার শেকল খুলে উঁকি দিলাম। টর্চ জ্বেলে দেখলাম, মা, মায়াও ছুটে এসেছে। তারাও বোধ হয় গিনির লোভে পড়ে গেছে। কিন্তু কোথায় গিনি!

চালতে গাছের নীচে এসে টর্চ জ্বেলে খোঁজাখুঁজি করতেই মা সহসা চাপা আর্তনাদের গলায় বলে উঠলেন, "পেয়েছি।"

মা গিনিটি নিয়ে একদৌড়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। আমাদের উল্লাস, বাবার কথা ভুলেই গেছি, বাবা যে আদিনাথের পিছু নিয়েছেন, সেও বোধ হয় গিনির লোভে।

আমাদের হুঁশ ফিরে এলে মা কেমন আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। গিনির লোভ দেখিয়ে মানুষটার না কোনও ক্ষতি করে বসে! আদিনাথকে আমরা কেউ চিনি না। তার যদি কোনও কুমতলব থাকে! আদিনাথ মানুষ না ভূত, তাও আমরা জানি না। যদি যখ হয়, আদিনাথকে খুন করে কোনও কোষাগারে তাকে কেউ যখ করে রেখে যেতেই পারে। এতদিন একনাগাড়ে যখ হয়ে থাকাও ক্লান্তিকর। বাবাকে যখ করে আদিনাথ যদি মুক্তি পেতে চায়! মায়ের ভয়ার্ত মুখ দেখে এখন কেন জানি মনে হল আমার। আর একদণ্ড যে দেরি করা ঠিক না বুঝতে কষ্ট হয় না।

আমি কিছু না বলেই টর্চ নিয়ে ছুটতে গেলেই মা হাত ধরে ফেললেন।

"একা অন্ধকার জঙ্গলে ঢুকবে না। তোমরা আর আমার মাথা খারাপ করে দেবে না। এই বিলু সঙ্গে যা। কী ঘুটঘুট্টি অন্ধকার! আমার হয়েছে মরণ! কেন আমি মরি না!"

দাদা বলল, "পড়া আছে। আমার দ্বারা হবে না।"

"তুই এত স্বার্থপর দাদা! তোর পড়াটা বেশি হল!" মা দেখছি অস্থির হয়ে উঠছেন। ঘর থেকে বের হয়ে জঙ্গলের দিকে তাকালেন— না, হারিকেনের কোনও আলো চোখে পড়ছে না। নিমেষে সব কেমন সুনসান হয়ে গেল। জোনাকি পোকা ছাড়া জঙ্গলে কোনও আলো দেখা গেল না। হাওয়া উঠলে গাছের পাতায় শুধু খসখস শব্দ উঠছে।

কী করি?

"অনাথকাকাকে ডাকি মা? সবাইকে খবরটা দিই!"

মা বললেন, "না। এলে কী বলবে! লোকটা তোমাদের যখন-তখন গিনি দিয়ে যায়, এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে!"

দাদা বলল, "প্রতিবেশী ডেকেছে, বাবা না গিয়ে পারে! ঠিক ফিরে আসবে। আদিনাথ-আদিনাথ করে বাবার মাথাটা কে খারাপ করেছে!"

দাদার ধমকে মা চুপ।

তবু আমরা হারিকেন নিয়ে কিছুটা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম। পরিত্যক্ত ইটের ভাটায় খোঁজ করা দরকার। কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে বেশিদূর যাওয়াও কঠিন। পুকুরপাড়ে এসে মা আর পারলেন না— 'কেন যে গিনি-গিনি করে মানুষটাকে এত নির্যাতন করলাম! আমি এখন কী করি! গিনির লোভে মানুষটা কোথায় একা অন্ধকারে ঢুকে গেল!'

তাল-বেতালের গল্প আমাদের পড়া আছে। ভূতের নানা চালাকির গল্পও আমরা কম পড়িনি! মাও পড়েছেন। সব গল্পের ভূতই এখন দূরের জঙ্গলটায় যে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে, মায়ের কপাল চাপড়ে কান্না থেকেই টের পেয়ে গেলাম।

মাকে দেখে মায়াও কাঁদতে বসে গেল।

দাদা বোধ হয় মায়ের মড়াকান্না শুনতে পাচ্ছে। বিরক্ত হতেই পারে। সবাই মিলে তার পড়ার বারোটা বাজাচ্ছে। সেও চলে এল, কিন্তু এ-দাদাকে যে আমি চিনতে পারি না।

দাদা বলল, "মা, তুমি বাড়ি যাও। পিলুকে নিয়ে দেখছি, কোথায় গিয়ে তিনি ঘাপটি মেরে বসে আছেন। বাবার তো সবই দৈব। দেশ ছাড়া থেকে বাড়িঘর তৈরি, সবই তাঁর দৈব। দৈবই করাচ্ছে সব। দ্যাখ না এবারের দৈব তাঁকে কী করায়!"

বড় পুত্রের কিছুটা সান্ত্বনাবাণীতে মার শোক কিছুটা যেন প্রশমিত হল। বিপদে-আপদে বাবা মচকাবেন কিন্তু ভাঙবেন না। আর মা সামান্য বিপদেই ভেঙে কুটিকুটি হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শয্যা নেবেন।

কিন্তু মা আমাদের ছাড়তে কিছুতেই রাজি হলেন না।

কী আর করা! বেশি জোরে ডাকাডাকি করাও মুশকিল। জঙ্গলের ওদিকটায় দেশের লোকজন ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। চেঁচামেচি করলে তারা ছুটে আসতে পারে, কর্তাঠাকুরের আবার এত রাতে কী বিপদ দেখা দিল!

আমরা সবাই অন্ধকার জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে আছি। বাবা যদি ফিরে আসেন! ফিরে এলে দূর থেকেই তাঁর হারিকেনের আলো দেখতে পাব। কিন্তু সেদিনের মধ্যে যদি আদিনাথের সঙ্গে কথা বলার আগেই হারিকেনটা নিভে যায়! আগে যা অতি তুচ্ছ ঘটনা ছিল, আজকে তাই বড় বেশি ঘোরতর ঘটনা মনে হচ্ছে।

এত গভীর রাতে খোলা আকাশের নীচে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। খুবই শীত করছিল। মা বললেন, "কপালে যা আছে হবে। তোমার বাবা এত দৈবনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে পারেন, আমি কেন পারব না। চলো, ঘরে চলো।"

দাদা ঘরে ঢুকেই মায়ের গায়ে একটা কাঁথা জড়িয়ে দিল। আমরাও যে যার মতো কাঁথা-চাদর মুড়ি দিয়ে বারান্দায় বসে থাকলাম বাবার ফেরার অপেক্ষায়। মা মাঝে-মাঝে খুবই অস্থির হয়ে পড়ছেন। কাঁথাটা গা থেকে ফেলে দিচ্ছেন, মায়া পাশে বসে। তার এখন একটাই কাজ, মাকে শীত থেকে রক্ষা করা। কাঁথা পড়ে গেলে গায়ে কাঁথা তুলে দিচ্ছে।

রাত বাড়ছে।

ধর্মরাজ ফিরে এলেও কিছু বোঝা যেত। এদিক-ওদিক বিন্দুমাত্র শব্দটব্দ হলেই আমি উঠোনে নেমে যাচ্ছি। যতটা দেখা যায় দেখছি। পাখিরা প্রহরে-প্রহরে কলরব করে যাচ্ছে। রাত কতটা, অনুমান করা যাচ্ছে না। শেষরাতের দিকে পাখিরা কি বেশি কলরব করে। মা যে দৈবনির্ভর হয়েও অস্থির, শেষবেলায় মা ডুকরে কেঁদে না উঠলে টের পেতাম না।

"যা হয় হবে। যাও সবাইকে খবর দাও। তোমাদের বাবাকে একটা লোক জঙ্গলে নিয়ে গেছে। তাকে আমরা চিনি না, জানি না। নিশ্চয়ই মানুষটা কোনও বিপদে পড়েছে।"

দাদাও বোধ হয় আর স্থির থাকতে পারছে না। সে বলল, "টর্চটা দে। চল সবাইকে খবরটা দিই।"

আমরা বের হব, দেখি পুকুরপাড় ধরে একটা হারিকেন এগিয়ে আসছে। আর বসে থাকা যায়! সবাই পড়িমরি করে ছুটছি। ধর্মরাজ ঘেউ-ঘেউ করছে। কাছে যেতেই বাবা অদ্ভুত গলায় বললেন, "আমাকে ছুঁয়ে দিয়ো না।"

বাবার এক হাতে হারিকেন, অন্য হাতে একটা রেশমের থলে। থলেটা বেশ যে ভারী, বোঝা যায়।

সহসা কী বলতে গিয়ে মায়ের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। "তুমি কি মানুষ!" সবটা আর বলতে পারলেন না।

বাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন, "দয়াময়ী মানুষ না হলে এত বড় বিপদ থেকে আদিনাথকে কে উদ্ধার করত! ভাগ্যিস সে এসেছিল।"

"আমরা ভয়ে মরছি, আর আদিনাথকে তুমি উদ্ধার করছ!"

মাকে নিয়ে আমাদের এই এক বিড়ম্বনা। সবটা না শুনেই ঝাঁপিয়ে পড়া। মা বাড়িতে দাদাকেই একমাত্র সমীহ করেন। দাদার কথায় মা চুপ করে গেলেন।

"আগে বাবাকে যেতে দাও। দেখছ না বাবা কেমন অশুচি হয়ে আছেন।" বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওটা হাতে কী আপনার?"

"থলে। দেখে বুঝতে পারো না। সরো। আমাকে যেতে দাও। মায়া দু' বালতি জল তুলে দে তো।"

"থলে! কিসের থলে!"

"গিনির। গিনির থলে।"

আমরা সবাই আকাশ থেকে পড়লাম, আদিনাথের বিপদ, কী বিপদ, হাতে রেশমের থলে, বলে কিনা থলেতে গিনি আছে !

বাবা আলগা হয়ে হাঁটতে থাকলেন। হারিকেনটাও দিলেন না। আমরা সবাই বাক্যহারা। বাবা গম্ভীর। তাঁর হাঁটার কায়দাও অন্যরকম। উঠোনে এসে হারিকেনটা রাখলেন, রেশমের থলেটা ছুড়ে বারান্দার এক কোনায় ফেলে দিলেন, ঝনাত করে শব্দ হল, মা ছুটে গেলেন থলেটা তুলতে, সঙ্গে-সঙ্গে বাবা চিৎকার করে উঠলেন, "খবরদার ওটা ছোঁবে না। ছুঁলে সর্বনাশ।"

মা কি আমার এ-সব কথা গ্রাহ্য করেন !

মা বললেন, "ছুঁলে ছাই হবে।"

কোনায় পড়ে থাকা থলেটা মা প্রায় তুলেই ফেলছিলেন। বাবার কুপিত গলা, "দয়াময়ী স্ববংশে নির্বংশ হতে চাও তো তোলো।"

থলেটা যেন বিষধর সর্পের মতো ফণা তুলে আছে। মা সিঁটিকে সরে গেলেন।

এবারে বাবা অত্যন্ত নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, "মায়া, মা আমার দু'-বালতি জল তুলে দাও। স্নানটা করি। গিনির লোভ ভাল না। গুপ্তধনের লোভ ভাল না। আদিনাথ খুবই বিপাকে পড়ে গিনি দিয়ে যেত। সে বিষহরির চেলা। সম্প্রতি তার পত্নীবিয়োগও হয়ে গেছে। জঙ্গলে থাকে, প্রেতাত্মার ভয় তার কম না। তার পত্নী ইন্দুমতী থলেটার লোভে ইটের ভাটা ছেড়ে যেতে পারছে না। আদিনাথ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত নয়, দস্যুবৃত্তিও জানে না। অচ্ছুত মানুষ। ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঢুকতেও তার ভয়। সে সাপ ধরে খায়। সোজা সরল মানুষ। পরের দ্রব্য লইলে চুরি হয়, বোঝো।"

আমি জানি, বাবার সব আশ্চর্য সংস্কার আছে ধর্মবিষয়ে। শাস্ত্রপাঠে এটা তাঁর হয়েছে। মনসাতলায় একবার একটা আধুলি রাস্তায় পেয়ে গেলে বাবা বলেছিলেন, "ঠাকুরের পায়ে ফেলে রাখো। ঠাকুরকে বাতাসা কিনে দেওয়া যাবে। একজন ভিখারিকেও দিয়ে দেওয়া যেত, কী দরকার, ঘরে যখন গৃহদেবতা আছেন, তাঁর সেবাতেই না হয় লাগুক। আধুলির বেলায় গৃহদেবতা, গিনির বেলায় সর্বনাশ, স্ববংশে নির্বংশ। সহ্য হয় !

আমি না বলে পারলাম না, "বাবা, ঠাকুরের পায়ে ফেলে রাখলে হয় না !"

বাবা, "ওঁম্ কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা" বলে মাথায় মগে জল ঢালছিলেন। সহসা আমার দিকে কুপিত দৃষ্টিতে তাকালেন। দুর্বাসার মতো চোখ তাঁর জ্বলছে। বললেন, "না, হয় না। দাসমশাই বিষয়ী মানুষ, বিচক্ষণ মানুষ, অপুত্রক, তাঁর সহ্য হবে। গরিবের সহ্য হবে না। আদিনাথ সাপের বিষ বিক্রি করে। কোদাল মেরে গর্ত থেকে সাপ টেনে তোলে। তাজা পুষ্ট সব কেউটে। গর্ত করতে গিয়ে মালসার মধ্যে থলেটা পেয়েছে। বিষহরি স্বপ্ন দেখিয়েছে, তুই কাউকে দিয়ে দে। নিজের কাছে রাখিস না। তারপর তার পুত্রটি সর্পদংশনে গেল। ইন্দুমতীর বিষম লোভ। কিছুতেই থলেটা হাতছাড়া করতে রাজি না। সুযোগ পেলে পাপ খণ্ডনের জন্য আদিনাথ চুরি করত গিনি। ঠাকুরের পায়ে ফেলে রেখে যেত।"

আমরা সবাই তখন উঠোনে গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছি। নড়ছি না। মা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে নির্বিষ সাপের মতো বাবাকে দেখছেন। দাদা পর্যন্ত বিপর্যস্ত। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। কেন এত দেরি, সারারাত ভাটায় পড়ে থাকলেন কেন, কোনও প্রশ্ন করতেই আর সাহস হচ্ছে না।

পুবের আকাশ দেখা গেল ফরসা হয়ে উঠছে।

বাবা গামছায় গা মুছতে-মুছতে শেষে বললেন, "লোভ অতি বিষম বস্তু। ইন্দুমতী টের পাচ্ছিল তার থলেতে দুটো গিনি নেই। সে আদিনাথের ওপর মহা খাপ্পা। তারপর যা হয়, গেল, সেও গেল— ব্রহ্মহত্যা হবে চোখের সামনে, সাপের লেজ ধরে টানাটানি করল, হয়ে গেল।"

তা হলে কি সেই রূপবতী কন্যাই ইন্দুমতী ! কে জানে !

বাবা শীতে হিহি করে কাঁপছেন। মা ধুতি-চাদর নিয়ে গেলেন। বাবা কাল সকাল থেকে প্রায় উপবাসে আছেন। বাবার দিকে তাকিয়ে মায়ের চোখে কেন যে জলের উদ্রেক হচ্ছে !

বাবা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে জলচৌকিতে বসলেন।

"ইন্দুমতীর পিণ্ডদান সারতেই এত দেরি হল। বেচারি যায় কোথায় ! অচ্ছুত মানুষেরও কম সংস্কার থাকে না। যত বলি আদিনাথ তুমি আমার প্রতিবেশী, প্রতিবেশী কখনও অচ্ছুত হয় ! ক্রিয়াকর্ম আজ রাতেই সেরে ফেলব। প্রেতাত্মার ঘোরে পড়ে তোমার শেষে সর্বনাশ হোক, প্রতিবেশী হয়ে সহ্য করতে পারব না। ওর ঘরেই সব ছিল, ভাটাতেও কম কিছু নেই। প্রেতশিলার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে হল। তিল, যব, হরীতকী, ঘৃত, মধু, মালসা, কলাপাতা কোনও কিছুরই অভাব নেই। কুশ কেটে আনা হল। ঘরে তার আতপ চাল, তিল-তুলসী ছিল। নির্বিঘ্নে সব কাজ শেষ করতেই থলেটা পায়ের কাছে রেখে বলল, "আমাকে মুক্ত করুন ঠাকুর।" বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও, দাসমশাইকে খবর দাও, আমি তাঁকে ডেকেছি। তাঁকে দিয়ে আমিও মুক্ত হই।"

দাসমশাই এসেই সর্বাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়ালে বাবা বললেন, "ওই যে ওখানে থলেটা আছে নিয়ে যান। গিনি কিন্তু আমার কাছে আর নেই। চাইলেও দিতে পারব না।"

থলেটা নিয়ে কর্তামার কাছেও করজোড়ে দাঁড়ান দাসমশাই। বলেন, 'দেবী, আপনি সত্যি দশভুজা।"

দাসমশাই রওনা হলে মা বাবাকে বললেন, "ওঁকে ডাকো।"

দাসমশাই ফিরে এলে মা বললেন, "আরও একটা গিনি কৌটোয় পড়ে আছে। ওটাও নিয়ে যান দাসমশাই। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। বড় ভয় লাগে।"

গতরাতে পাওয়া গিনিটাও শেষপর্যন্ত মা রাখতে আর সাহস পেলেন না। দাসমশাইকে গিনিটা দিয়ে মা যেন আমার রাহুমুক্ত হলেন।

দাসমশাই বাড়ি থেকে চলে গেলে বাবা তাঁর ইদানীংকার আপ্তবাক্যটি ফের উচ্চারণ করলেন, "বুঝলে দয়াময়ী, কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে— কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে— আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না।"